প্রিয়তমা

বিমল মিত্র

২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট • কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম মুদ্রণ
আষাঢ় ১৩৬৫

প্রকাশক :
শ্রীহরিপদ বিশ্বাস
সাহিত্য প্রকাশালয়
২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রাকর :
শ্রীনিতাই চন্দ্র ভুক্ত
দি জয়গুরু প্রেস
১৬/এ, অবিনাশ ঘোষ লেন
কলিকাতা-৬

প্রিয়তমা

গঙ্গাচরণ বাবুর গঙ্গা লাভ

গঙ্গাচরণ বাবুকে এ পাড়ায় সবাই চেনে। তাঁর সামনে সবাই তাঁকে বলত গঙ্গাচরণ বাবু, আর পেছনে বলত গঙ্গার দিকে পা। কারণ, যদি কেউ জিজ্ঞেস করত তাঁকে, "কেমন আছেন?" মুখ বেঁকিয়ে ঠোঁট কুঁচকে জবাব দিতেন তিনি—"আর আছি কেমন? দিন তো ফুরিয়ে আসছে—এবার গঙ্গার দিকে পা।" ইংরাজীতে যাকে বলে "পেসিমিষ্ট", গঙ্গাচরণ বাবু ছিলেন তাই। পেশায় তিনি ছিলেন উকীল আর ছিলেন দর্শনশাস্ত্রে এম. এ.। দর্শনশাস্ত্রে তাঁর ঝোঁক ছিল বরাবরই আর এতে তাঁর পাণ্ডিত্যও ছিল প্রগাঢ়। এত বেশী পড়েছিলেন তিনি যে পড়ে তাঁর মাথার ঘিলু অবধি গিয়েছিল গুলিয়ে। এমনিতে তিনি ছিলেন একজন সাধারণ মানুষ—এই আমি-আপনি যেমন আব কি! কিন্তু এক এক সময়ে তাঁর মাথায় খুন চাপত। তখন জোয়ারের সময় গঙ্গার মতো, সাধারণ গঙ্গাবাবু হয়ে উঠতেন অসাধারণ গঙ্গাবাবু।

এক সময় তাঁর সখ হলো ফটো তোলার। অনেক টাকা খরচ করে একটা দামী ক্যামেরা কিনে ফেললেন তিনি। আব সেই সঙ্গে কিনলেন কয়েকটা ফটোগ্রাফির বই।

কতকগুলো ফটো তুলে আমাকে দেখালেন তিনি। বললেন, —"দেখ তো ডাক্তার, কেমন হয়েছে ফটোগুলো?"

ফটোগুলো সত্যিই ভাল হয় নি। তবু তাঁর মন রেখে বললাম, "ভালই তো।"

—"আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ তুমি? আমি জানি আমার ফটো কেমন হয়েছে। তবে জেনো, একদিন আমার ফটো সেরা পত্রিকায় ছাপা হবে আর তাতে পাবে প্রথম পুরস্কার।"

হলোও তাই। কিন্তু তারপর ফটো তোলা একেবারে ছেড়ে

দিলেন তিনি। ক্যামেরাটাও বিক্রি করে দিলেন, সেই সঙ্গে নির্বিচারে।

তারপরে তাঁর মাথায় চাপল আর এক খেয়াল। একদিন শুনলাম গঙ্গাচরণ বাবু কোথায় উধাও হয়ে গেছেন। অনেক খোঁজ করেও কোন সন্ধান পাওয়া গেলনা তাঁর। মাস দেড়েক পরে হঠাৎ ফিরে এলেন তিনি। বললেন,—"দেখ, বেড়াবার সখ হয়েছিল, তাই ঘুরে এলাম। দিল্লী, আগ্রা থেকে মাদ্রাজ ত্রিচিনোপল্লী অবধি কিছু আর বাকি নেই।"

—"কেমন লাগল ?"—জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"এখানেও যেমন আকাশ, মাটি, জল," গঙ্গাচরণ বাবু জবাব দিলেন,—"ওখানেও তেমনি আকাশ জমি আর জল,—কোন তফাৎ নেই।"

মুখ বেঁকিয়ে ঠোঁট কুঁচকে বলে চললেন তিনি—"বেড়ানটা শুধু একটা নেশা। বাজে, বাজে—একেবারে বাজে—যাচ্ছেতাই।"

হঠাৎ শুনলাম একদিন, গঙ্গাচরণ বাবু তাঁর প্র্যাকটিস্ ছেড়ে দিয়েছেন। মনে পড়ল অনেকদিন আগে তিনি বলেছিলেন –"এই গঙ্গাচরণ চ্যাটার্জি একদিন জন্মেছিল সে অতি গরীবের ঘরে। আর একদিন সে ঠিক হবে শহরের সেরা উকীলদের মধ্যে একজন। আর সেইদিন সে ছেড়ে দেবে তার সব প্র্যাকটিস্।"

গিয়ে বললাম,—"হঠাৎ একি করলেন, গঙ্গাবাবু ?"

—"ঠিকই করেছি। লোক টাকা উপায় করে নিজের সুখের জন্য। দেখলাম টাকায় কোন সুখ নেই। টাকার বোঝা বইতে মোটেই আর ভাল লাগে না আমার। তবে টাকার আমার কি দরকার ?"

—"আপনার দরকার না থাক, আপনার ছেলের কথা তো ভাবতে হবে।"

—"ভাববার আর কি আছে? যদি 'Struggle for existence'

এ বাঁচতে পারে তো বাঁচবে, নইলে মরবে—কারণ এই হলো জগতের নিয়ম।”

—“কিন্তু আপনারও তো একটা দায়িত্ব আছে।”

—“কারুর জন্য কারুর কোন দায়িত্ব নেই এ দুনিয়ায়। ও সব শুধু এক ফাঁকা বুলি।”

মুখ বেঁকিয়ে ঠোঁট কুঁচকে গঙ্গাচরণ বাবু বললেন—“বাজে, বাজে—একেবারে বাজে—যাচ্ছেতাই।”

আমি ছিলাম গঙ্গাচরণ বাবুর বাড়ীর পারিবারিক চিকিৎসক। একদিন টেলিফোনে এক জরুরী কল পেয়ে গেলাম ওঁর বাড়ীতে। দেখি, গঙ্গাচরণ বাবু এক ইজিচেয়ারে বসে আলবোলা টানছেন। পাশের টেবিলে পড়ে রয়েছে কতকগুলো মোটা মোটা বই।

আমি যেতেই ধড়মর করে উঠে বসলেন তিনি। বললেন—“এসো ডাক্তার, এতক্ষণ তোমারই অপেক্ষা করছিলাম আমি।”

—“কার অসুখ করেছে বাড়ীতে?” জিজ্ঞেস করলাম আমি।

—“অসুখ আমার– শরীরের নয়, মনের। প্রায়ই মনে হয় এ জীবনটা শেষ করে ফেলি। কিছুই আর ভাল লাগে না আজকাল। দুনিয়াটা নেহাৎ একঘেয়ে আর পুরোনো হয়ে গেছে।”

“এ এক ধরণের মনের অসুখ”--অমি জবাব দিই।

—“হ্যাঁ ডিপ্রেসিভ সাইকোসিস্। পড়ে দেখলাম এর চিকিৎসার আছে মাত্র দুটো উপায়—এক লিউকোটমি বা অস্ত্রোপচার করে মস্তিষ্কের খানিকটা বাদ দেওয়া; তা এসব অপারেশন বিলেত-আমেরিকা ছাড়া আর কোথাও হয় না। আর দ্বিতীয় উপায়, শক্-থেরাপী।”

এই বলে টেবিলের উপর রাখা বইগুলো আমায় দেখালেন গঙ্গাবাবু। দেখলাম সেগুলো ফ্রয়েড, জুঙ্গ আর এডলারের লেখা দুরূহ মনস্তত্ত্বের কেতাব।

গঙ্গাচরণ বাবুকে নিয়ে গেলাম এক মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের কাছে। গঙ্গাচরণ বাবু যা বলেছিলেন, সেই ব্যবস্থাই হলো। শক্-থেরাপীর নির্দেশ দিলেন মনঃসমীক্ষক মশাই।

শক্-থেরাপীতে* ইলেকট্রিক কারেণ্ট চালিয়ে দেওয়া হয় মাথায়। ফলে জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যায়। তারপর অঙ্গে অঙ্গে আর পেশীতে পেশীতে সুরু হয় আক্ষেপ। মনে হয় প্রাণটাই বুঝি বেরিয়ে যাবে যন্ত্রণায় আর আক্ষেপনে। কোন কোন সময়ে প্রাণ সত্যিই বেরিয়ে যায়, এই আসুরিক চিকিৎসাতে। সেই যন্ত্রণার চোটে মনের যত অসংযত খামখেয়াল সব পালায় মন ছেড়ে বাপ বাপ বলে। এই চিকিৎসা-প্রণালী অনেকটা চাবুক মেরে বিনা তালিম দেওয়া ঘোড়াকে বশে আনার মতো। কিন্তু গঙ্গাচরণ বাবুর মন ছিল এঁটেল মাটির মত শক্ত—তার উপর দর্শনশাস্ত্রের রস পান করে, তা হয়ে উঠেছিল তেএঁটেল। কোন চাবুকেরই সাধ্য ছিল না তাকে বশে আনা। সুতরাং শক্-থেরাপীর পর যখন আমি গঙ্গাবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম—"কেমন বোধ করছেন?" মুখ বেঁকিয়ে ঠোঁট কুঁচকে তিনি জবাব দিলেন—"কৈ আর ভাল আছি বল? কিছুতেই কিছু হয় না। বাজে, বাজে—সব বাজে—যাচ্ছেতাই।"

গঙ্গাচরণ বাবুর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁকে খুলে বললাম সব কথা। উপদেশ দিলাম, গঙ্গাচরণ বাবুকে সুখের চেয়ে শান্তিতে রাখা দরকার, যাতে তাঁর মনে কোনরকম চাঞ্চল্য না আসতে পারে। আর বললাম, তাঁর গতিবিধির উপর সব সময়ে নজর রাখতে, যাতে কোন রকম কিছু না করে বসেন তিনি। এ রোগে আত্মহত্যা—প্রবণতা প্রায়ই দেখা যায়।

এর পর বহুদিন গঙ্গাচরণ বাবুর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। তবে তাঁর খবর পেতাম প্রায়ই লোক মুখে। শুনলাম তাঁর স্ত্রী নাকি

---

* শক্-থেরাপীর সব ডিপ্রেসিভ সাইকোসিসের রোগী নিরাময় হয় না। যে কোন Psychiatry-এর বই দ্রষ্টব্য।

কোথা থেকে এক দাড়িওয়ালা গেরুয়াধারীকে আনিয়াছেন বাড়ীতে। আর সেই সাধুবাবার কাছে গঙ্গাচরণ বাবু নাকি সস্ত্রীক দীক্ষা নিয়েছেন। এখন নাকি সজোরে চলছে তাঁদের পূজা পাঠ আর ধর্মকর্ম। রোজ নাকি তাঁদের বাড়ীতে চণ্ডীপাঠ হয় আর শ্রীমদ্-ভাগবত গীতার আলোচনা চলে।

শুনে মনটা সত্যিই খুশীতে ভরে গেল। যাক, গঙ্গাচরণ বাবু, অনেকটা সামলেছেন তাহলে। অনেক সময় শক্-থেরাপীতে যাদের চৈতন্য হয় না, হয়ত এক সাধারণ লোকের Suggestion-এ তাদের মনের হতে পারে আমূল পরিবর্তন।

একদিন হঠাৎ রাস্তায় দেখা হয়ে গেল গঙ্গাচরণ বাবুর সঙ্গে। মাথার চুল তাঁর উসকো-খুসকো, গায়ে একটা আধময়লা পাঞ্জাবী, তার আবার বোতামগুলো সব দেওয়া নেই। চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত।

জিজ্ঞেস করলাম—"কেমন আছেন গঙ্গাবাবু?"

—"আমি বেঁচে আছি?"—গঙ্গাবাবু শুধালেন আমায়।

—"কি বলছেন আপনি? আপনাকে যে জলজ্যান্ত দেখছি চোখে।"

"একটা মরীচিকাও লোকে চোখে দেখে।"

"আর আপনার কথাও যে শুনছি কানে।"

"একটা ফাঁকা প্রতিধ্বনিও লোকে কানে শোনে।"

কি তর্ক করব আর এই দার্শনিক পণ্ডিতের সঙ্গে? আমি সক্রেটিসও নই, প্লেটোও নই, একজন সামান্য ডাক্তার মাত্র। সুতরাং বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিলাম তাঁর কথা, মাথাটা হেলিয়ে।

—"আমি আর মানুষ নই। যে-গঙ্গাবাবুকে জানতে, সে অনেকদিন মরে গেছে। যাকে সামনে দেখছ, সে তার এক হীন, জঘন্য, ঘৃণিত প্রেতাত্মা।"

—"শুনলাম নাকি এক সাধুর কাছে দীক্ষা নিয়েছেন—মন দিয়েছেন নাকি ধর্মচর্চায়?" কথাটার মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি তাঁকে।

—"ভেবেছিলাম অনেক কিছু আছে এতে। অনেক আশা ছিল মনে। দেখলাম সব ভুয়ো, সব ফাঁকা, সব শুধু আত্মপ্রবঞ্চনা—" মুখ বেঁকিয়ে ঠোঁট কুঁচকে বলে চললেন তিনি,—"বাজে, বাজে সব বাজে—যাচ্ছেতাই!"

দেখলাম যে গঙ্গাবাবু ছিলেন, সে গঙ্গাবাবুই আছেন। কোথাও কোন পরিবর্তন তাঁর হয় নি।

এর কিছুদিন পরের কথা। রাত্রে শুয়েছিলাম আমি। কড়া-নাড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। দরজা খুলে দেখি বাইরে দাঁড়িয়ে আছে গঙ্গাবাবুর ছেলে। মুখেচোখে তার আশঙ্কার ভাব। ভয়-ব্যাকুল কণ্ঠে সে বললে—"এখুনি চলুন ডাক্তার বাবু, বাবার শরীর ভাল নয়। সারারাত ধরে কি রকম যেন করছেন—বোধহয় কোন বিষ খেয়েছেন।"

খবরটা শুনে চমকে উঠলাম আমি। অবশ্য এতে আশ্চর্য হবার বিশেষ কিছু ছিল না, কারণ কোন কিছুই অসম্ভব নয় গঙ্গাচরণ বাবুর পক্ষে।

ব্যাগটা নিয়ে তক্ষুণি ছুটলাম আমি গঙ্গাচরণ বাবুর বাড়ী। এসে দেখি বিছানায় শুয়ে ছটফট করছেন গঙ্গাবাবু, চোখ তাঁর রক্তবর্ণ হাত-পা হিম হয়ে এসেছে। বুঝলাম কোন কড়া ঘুমের ওষুধ তিনি খেয়েছেন অত্যধিক মাত্রায়।

—"একি করে বসলেন আপনি গঙ্গাবাবু?" জিজ্ঞাসা করলাম আমি—"আবার আত্মহত্যার মতলব?"

"—যা করেছি ঠিকই করেছি। আমার সব কথা শোন ডাক্তার তাহলে দোষ দিতে পারবে না আমায় মোটে। শোন, আজ বিকেলে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম আমি। ছড়িটা ঘোরাতে ঘোরাতে পথ দিয়ে হেঁটে চলেছিলাম আনমনে। এক জায়গায় এসে আমার চমক ভাঙল। দেখি রাস্তার ধারে ছেলেরা সব কলরব করে খেলা

করছে। কোন ছেলের হাত থেকে ছোঁড়া লাট্টু ঠিক আমার সামনে এসে ঘুরতে লাগল বন্ বন্ করে। হঠাৎ আমার মনে হোল আমিও তো ঠিক ঐ খেলার লাট্টুর মতই। জানি না কোথা থেকে এসেছি, আর কে ঘুরিয়ে দিয়েছে আমায় দম দিয়ে। শুধু জানি, জীবনচক্রে ঘুরে চলেছি আমি অবিরাম বন্ বন্ করে। ভাবলাম এই তো জীবন, আর এরই জন্যে বেঁচে রয়েছি আমি? বাজে, বাজে -একেবারে বাজে—যাচ্ছেতাই। তখুনি এক ওষুধের দোকানে গিয়ে কিনলাম এক বোতল ঘুমের ওষুধ। তারপর এক এক করে সব কটা ট্যাবলেট গলধঃকরণ করলাম। জগতে যা দেখবার ডাক্তার, সে তো সব দেখে নিয়েছি। এ জগতের পরেও যদি কোন জগৎ থাকে—সেই দেখতেই এখন চললাম।"

—"আর সে জগৎ যদি না থাকে।"

—"তাহলে অন্ততঃ এখানে আর ফিরে আসব না। এ জগৎ—" মুখ বেঁকিয়ে ঠোঁট কুঁচকে গঙ্গাচরণবাবু বলে চলেন,—"বাজে, বাজে, একেবারে বাজে—যাচ্ছেতাই!"

অনেক করে গঙ্গাচরণ বাবুকে বাঁচান গেল। সজ্ঞানে না হোক, অজ্ঞানেও গঙ্গালাভ গঙ্গাবাবুর হলো না। ভেবে পাই না, গঙ্গাচরণ বাবুর পরিহাসটা কার উপর—নিজের উপর, না যে জগৎ তাঁকে বুঝল না, তার উপর? কিম্বা হয় তো সেই খামখেয়ালী সৃষ্টিকর্তার উপর হবে, যিনি এই দুনিয়ার আজব চিড়িয়াখানায় গঙ্গাচরণবাবুর মতো একটি জীবকেও পাঠিয়েছিলেন ভবের খেলা খেলতে।

আত্মারাম বুধিয়ার কাহিনী

আত্মারাম ছিলেন রাজস্থানর লোক, অর্থাৎ মারোয়াড়ী। বড়ভাই বিষ্ণুরাম বুধিয়া কলকাতার বড় বাজারে ঘৈ এর ব্যবসা করতেন আর আত্মারাম করতেন তার তদারক। ঘৈ-এর ব্যবসা মানে সাপের চর্বিকে ঘি বলে চালানো আর কি! তখন যুদ্ধের সময় বাজার একেবারে আগুন। সেই আগুনের তাতে লাল হয়ে উঠতে লাগলেন বিষ্ণুরাম আর সেই সঙ্গে মেজাজও তাঁর উঠতে লাগল তেতে। কারণ যেখানেই টাকার আমদানী, সেখানেই হয় ভাগের টানাটানি আর সে টানাটানিতে মনের বাঁধন যায় ছিঁড়ে। একদিন বিষ্ণুরাম আত্মারামকে ডেকে তো স্পষ্টই বললেন—

"যথেষ্ট হয়েছে ভাই, এবার তুমি নিজের পথ দেখ। এতদিন ধরে আমার ঘাড় ভেঙে খেয়েছ তুমি, কিন্তু তাবলে আমার কারবারে তোমায় ভাগ বসাতে দিতে পারি না।"

পরের দিন তল্পীতল্পা বেঁধে আত্মারাম কলকাতা ত্যাগ করলেন—চলে এলেন একেবারে সোজা বম্বে। অনেক ঘোরাঘুরি করে জোগাড় করলেন তিনি একটা মিলিটারী কনট্রাক্ট। কাজ সামান্য, সৈন্যদের কাঁচা মাংস জোগানোর ভার। মাংস মানে অবশ্য ভেড়ায় মাংস, কিন্তু আত্মারাম তার একটা ব্যাপক অর্থ ধরলেন। তিনি ভাবলেন যে, যদি ভেড়ার মাংস মাংস হয়, তবে গরুর মাংস কেন মাংস নয়? আর ঘোড়ার মাংসই বা কি দোষ করলে? তর্কশাস্ত্রের দিক দিয়ে এযুক্তি যে অকাট্য তাতে কোন সন্দেহ নেই আর অর্থনীতির দিক দিয়ে তো বটেই।

আত্মারাম ছিলেন একজন জাত ব্যবসায়ী কারণ, খাস মারোয়াড়ি সুতরাং যা ভাবা, তাই কাজ। প্রতিদিন একপাল ঘোড়া আর গরু

জবাই করে তাদের মাংস পাঠান হতো ক্যান্টনমেন্টে আর তাকে ভেড়ার মাংস বলে চালান হতো যথরীতি ঘুষ খাইয়ে। বলাবাহুল্য এতে লাভ হতে লাগল চতুর্বর্গ—শুধু দারুণ নয়, একেবারে নিদারুণ। শেষে যুদ্ধ থামলে, আত্মারাম যখন তাঁর ব্যবসাপত্র গুটিয়ে ফেললেন, তখন দেখলেন যে তাঁর নামে বেশ মোটা অঙ্কই জমা আছে ব্যাঙ্কে।

তখন আত্মারামের অভিলাষ হলো ফিল্মের কাজে নামতে। যারা থাকেন বম্বেতে আর যাঁদের হাতে থাকে কাঁচা পয়সা, তাঁদেরই ঘাড়ে চাপে ঐ ভূত। তাছাড়া আত্মারামের বয়স তখন ছিল যৌবনের কোটায়, যখন মনের মধ্যে রঙিন কল্পনা কাচের জারে রাখা রঙিন মাছের মতোই খেলা করে বেড়ায়।

অতঃপর অলম্ অতি বিস্তারেন। দিন দুয়েকের মধ্যেই, আত্মারাম নিজের ভোল বদলে ফেললেন। স্মুরেটা চপ্‌পল ছেড়ে শুরু করলেন সার্জের স্যুট, বিড়ি ছেড়ে ধরলেন থ্রি কাসল্‌স্ সিগারেট আর চুয়া দহি ছেড়ে ধরলেন বিলাতী ভোজ। তাছাড়া মাঝে মাঝে গোপনে বিলাতী বোতলের লাল জল যে চলত না এমন নয়, তবে দেশাই এর ভয়ে প্রকাশ্যে খেতে সাহস করতেন না।

ফিল্ম্ তৈয়ারীর কার্যসূত্রে কয়েকটি সুন্দরী অভিনেত্রীর সঙ্গে আত্মারামের আলাপ পরিচয় হোল। শিগ্‌গিরই আলাপ পরিণত হোল ঘনিষ্টতায় আর ঘনিষ্টতা পরিণতি পেল তথাকথিত প্রেমে।

বলাবাহুল্য এসব হোল খরচ সাপেক্ষ খামখেয়াল। পঞ্চ-মকারের সাধনায় ব্যাঙ্কের জমানো টাকা হু হু করে বেরিয়ে যেতে লাগল—চৌবাচ্ছার মুখ খুলে দিলে জল যেমন হু হু করে বেরিয়ে যায় আর কি! যে ফিল্‌ম্ তেরী করার কাজে আত্মারাম নেমেছিলেন, তা শেষ হবার আগেই তিনি দেখলেন, শুধু যে তাঁর হাত খালি তা নয়, ঋণে মাথার চুল অবধি বিক্রি।

তখন সব রস শুকিয়ে গেল, রঙিন স্বপ্ন গেল [illegible], নেশার মৌতাত গেল ছুটে। আত্মারাম গেলেন অভিনেত্রী সুলোচনার

বাড়ী। গিয়ে বললেন—"এতদিন তোমায় তো অনেক টাকাই দিয়েছি না চাইতে—আজ এ সময়ে তার কিছুটা তো ফিরিয়ে দাও।"

সুলোচনা সুলোচনে কটাক্ষবাণ হেনে জবাব দিলেন—"দুধওয়ালা গরু পেলে সকলে তার দুধ দুয়ে নেয়—কারণ এইটেই হলো জগতের নিয়ম। সে দুধ নিজে না পান করে যে সেই গরুকেই খাওয়াতে হবে, এমন কথা তো কুত্রাপি কখনও শুনিনি।"

যুক্তির যাথার্থ্যে সত্যিই সন্দেহ করার কিছু ছিল না। আত্মারাম বুঝলেন যে এখানে বিশেষ কিছু সুবিধা হবে না। অন্য কোথাও কোন সুবিধা হবে বলেও তাঁর আর আশা রইল না। তবুও আর একবার ভাগ্যটা যাচাই করতে গেলেন নর্তকী নীলিমার কাছে। সব কথা বললেন তাকে অকপটে। রক্তিম আস্যে চটুল হাস্য টেনে সুন্দরী নীলিমা তাঁকে জানিয়ে দিল—"টাকা ? টাকা দিতে তো ঠিক জানি না। চিরকাল নিয়েই এসেছি—তাই নিতেই শুধু জানি।"

মুখের মতো জবাব পেয়ে আত্মারাম সে স্থান ত্যাগ করলেন বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁর মনে হোল মাতৃজঠর থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁর সত্যিকারের চোখ ফোটেনি কোনদিনই।

আজ যেন সে চোখ ফুটল।

এদিকে ভাণ্ডার কপর্দ্দক-শূন্য, ওদিকে পাওনাদারদের তাগাদা। যথা সময়ে আদালতের ডিক্রিও জারি হোল। তখন আত্মারাম দেখলেন ফেরারী হওয়া ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই। হাতে যে কটা টাকা ছিল তাই দিয়ে একখানা ডার্বি লটারির টিকিট কিনে আত্মারাম চড়ে বসলেন এক মরিশাসগামী জাহাজে। জাহাজের ডেক থেকে তিনি খুরে খুরে দণ্ডবৎ হয়ে নতি জানালেন সেই ভোগ্যোন্মত্ত, বিলাস চঞ্চল আলোকোজ্জ্বল বোম্বাই নগরীকে।

মরিশাসে পৌঁছে আত্মারাম শুরু করলেন তাঁর পৈত্রিক পেশা, অর্থাৎ ঘি-এর ব্যবসা। আবার দু পয়সা আমদানি হতে লাগল, কারণ একাজে আত্মারাম ছিলেন সিদ্ধহস্ত। হাতে বেশ দু পয়সা

জমলে, আত্মারাম একদিন আবার পাড়ি দিলেন বোম্বাই শহরের দিকে।

বম্বেতে একটা হোটেলে উঠলেন আত্মারাম। পায়ের জুতো ছিঁড়ে গিয়েছিল। সেজন্যে তিনি দোকান থেকে একজোড়া জুতো কিনলেন। দোকানদার একটুকরো খবরের কাগজে বেঁধে জুতোটা আত্মারামের হাতে দিল।

হাতে কোন কাজ ছিল না, তাই হোটেলে এসে জুতোর প্যাকেটটা খুলে খবরের কাগজের টুকরোটা পড়তে লাগলেন আত্মারাম। তাতে লেখা ছিল এই কথা যে লটারির ফাস্ট প্রাইজ আত্মারামের নামেই এসেছিল, কিন্তু তিনি তখন ছিলেন ফেরারী। তাই টাকাটা ফিরিয়ে নিয়ে দেওয়া হয়েছে আর একজন লোককে। খবরটা পড়ে আত্মারাম তক্ষুণি হার্টফেল করে মারা গেলেন।

আমার কাহিনী এখানেই শেষ হলো। তবে একটা কথা বলা বাকি আছে। গল্প লেখা শেষ হলে ভাবলাম এটা কি হোল—ট্রাজিডি না কমিডি, না ব্যঙ্গাত্মক, না নিছক রস-রচনা? হঠাৎ মনে হোল আমাদের জীবনটাই তো এই—জীবনের রস যে কতখানি মিষ্টি আর তেতো, টক আর ঝাল, তা আরিষ্টটল প্লুটো থেকে শুরু করে এই অধম লেখক অবধি ভেবে ঠিক করতে পারেন নি। সে তত্ত্ব নিরুপনের ভার পাঠকদের হাতেই আমি ছেড়ে দিলাম।

দেবতার অভিশাপ

একেই বলে অদৃষ্ট বা দুরাদৃষ্ট। ইণ্টারমিডিয়টে ফেল করে রেলের চাকরিতে ঢুকেছিলাম। পাঁচ বছর একঘেয়ে এ্যাসিস্টেণ্ট স্টেশন মাস্টারের কাজ করে জীবনটা যখন নেহাৎ একঘেয়ে হয়ে উঠেছিল, তখন একদিন পেলাম বদলীর অর্ডার। কিন্তু তা বলে বদলী করতে হয় কিনা এমন জায়গায়! পার্বত্য আসাম অঞ্চলের এক অতি নগণ্য ছোট স্টেশন—টাইম টেবিলে যার নাম খুঁজতে রীতিমতো বেগ পেতে হয় সেখানেই আমাকে বহাল করা হয়েছে স্টেশন মাস্টার করে। বদলী অবশ্য মনে মনে আমি চাইছিলাম, কিন্তু আমার অদৃষ্টে সবই "উল্টা বুঝলি রাম।"

যাবার ইচ্ছে থাক আর না থাক, চাকরি বজায় তো রাখতেই হবে। সুতরাং একদিন তল্পীতল্পা বেঁধে বেরিয়ে পড়লাম। স্টেশনটি একটি ব্রাঞ্চ লাইনের উপর; দিনান্তে একটি আপ আর একটি ডাউন ট্রেন ওখানে থামে। বলাবহুল্য, এ লাইনের সব ট্রেনই লেটে চলে। অসময়ই এখানকার সময় আর তাতেই এখানকার অধিবাসীরা অভ্যস্ত, বরঞ্চ ট্রেন সময়ে এলে, তারা বিব্রত হয়ে পড়ে।

খোঁড়া ঘোড়ায় যিনি চড়েছেন, তিনি জানেন, ঢিমে তেতালায় চলা কাকে বলে। আমাদের গাড়িও তেমনি ঢিমে তেতালায় চলছিল। বিকেলে পৌঁছবার কথা, কিন্তু তার অনেক আগেই সন্ধ্যে ঘনিয়ে এল। উঁচু উঁচু পাহাড়গুলোর মাথায় অন্ধকার নেমে আসছিল আর সে আঁধারে দুপাশের ধানখেত আর চা-বাগানগুলো লেপে একাকার হয়ে গেল। দেখলাম যে গন্তব্য স্থানে পৌঁছুতে বেশ রাত হয়ে যাবে। তারপর সেই পাণ্ডব বর্জ্জিত জায়গা, কোথায় মিলবে আহারের সংস্থান আর রাত কাটাবার আস্তানা? সুতরাং বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লাম।

কিন্তু যখন সত্যিই পৌঁছুলাম, দেখলাম চিন্তা আমাব নিরর্থক। আমার অভ্যর্থনায় সকলেই সেখানে হাজির। স্টেশন মাস্টার যতীন বাবু (যাঁর জায়গায় আমি এসেছি), পয়েন্টস্‌ম্যান রামনিবাস, এমন কি জমাদার ভগৎ সিং পর্যন্ত উপস্থিত। মালপত্র নিয়ে প্লাটফর্মে নেমে পড়লাম। প্লাটফর্ম মানে লাল সুড়কি দিয়ে উঁচু করা খানিকটা জায়গা আর তার উপর খানিক দূরে দূবে টিমটিমে তেলের আলো জ্বলছে। জমাদার ভগৎ সিং আমার মালপত্র নিজের কাঁধে তুলে নিলে।

খানিক দূরে দেখি, এক ভদ্রলোক এক লণ্ঠন হাতে ট্রেনের কামরাগুলোতে কাকে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছেন। মুখ বাড়িয়ে প্রত্যেক কামরার ভেতরটা তিনি দেখে নিচ্ছেন আর যে সব কামরায় আলো নেই (যাত্রীরা বাল্‌ব খুলে নিয়েছে বা তার ছিঁড়ে দিয়েছে এবং রেলের কর্তৃপক্ষও সে বিষয়ে উদাসীন) নিজের হাতেব লণ্ঠন উঁচিয়ে সে সব কামরা তিনি খুঁজছেন। চলতে চলতে ভদ্রলোক ঠিক আমাব সামনে এসে উপস্থিত হলেন। লণ্ঠনের মৃদু আলোতে তাঁর মুখটা দেখে আমি চমকে উঠলাম। মনে হোল এঁকে যেন আমি চিনি। কোথায় যেন দেখেছি অনেকদিন আগে। অথচ ঠিক মনে কবতে পাবলাম না। ভদ্রলোককে ডেকে জিজ্ঞেস করতে যাব, কিন্তু ততক্ষণে তিনি চলে গেছেন।

যতীন বাবুর দিকে একটা চোখের ইঙ্গিত কবে পয়েন্টস্‌ম্যান রামনিবাস বললে—"আজকেও পাগলা সায়েব এসেছে বেলগাড়ি খুঁজতে।"

যতীনবাবু জবাব দিলেন—"তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? কতদিন ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে ওঁকে আমি এখানে আসতে দেখেছি—আজ তো আর সে সব কিছু নেই।"

—"কিন্তু কেন—কি ব্যাপার?"—আমি প্রশ্ন কবলুম।

—"ওই ওঁর একটা খেয়াল।"—যতীনবাবু কথাটা এড়িয়ে গেলেন।

—"কে উনি ?"—আমি আবার প্রশ্ন করলুম।

—"এখানকার চা-বাগানের ম্যানেজার।"—যতীনবাবু জবাব দিলেন।

যতীনবাবু আমায় নিয়ে এলেন তাঁর বাসায় অর্থাৎ রেলওয়ে কোয়ার্টার্সে। দুখানা ছোট ছোট ঘর আর এক ফালি বারান্দা—কাল থেকে এটাই হবে আমার আস্তানা। আমাদের দুজনের খাবার তৈরী করাই ছিল। রাত বেশ হয়েছিল। সুতরাং বেশী দেরী না করে আমরা খেয়ে নিলাম। তারপর দুটো চৌকি পেতে আর তার উপর বিছানা বিছিয়ে আমরা নিদ্রার উদ্যোগে প্রবৃত্ত হলাম। যতীনবাবু কিছুক্ষণ গল্প করলেন—রেল কর্মচারীর দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা আর নিত্য-নৈমিত্তিক অভাব-অনটনের কথা, যা শুনলে চোখে ঘুম আসতে দেরী হয় না। শুনতে শুনতে কখন যে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, তা জানি না।

মাঝ রাত্তিরে ঘুম ভেঙে গেল, বোধহয় গরমের জন্যই। হাত-পাখাটা নিয়ে বাইরের দাওয়ায় বেরিয়ে এলাম। কৃষ্ণপক্ষের বিবর্ণ চাঁদ তখন ঢলে পড়েছে একটা উঁচু পাহাড়ের মাথায়। ম্লান চাঁদের আলো শেষবারের মতো তার রূপালী পরশ বুলিয়ে নিচ্ছে ঘুমন্ত পল্লীটার উপর।

মানুষের অবচেতন মন এক এক সময়ে অদ্ভুত কাজ করে। যখন শত চেষ্টাতেও মনে আসে না কোন কথা, তখন আচমকা স্মৃতির দুয়ার খুলে যায়—মনে পড়ে যায় ভুলে যাওয়া অতীত। তেমনি হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল স্টেশনে দেখা সেই পাগলা সায়েবের মুখ আর সেই সাথে মনে পড়ে গেল তার সঙ্গে একদিন আমার যে পরিচয় ছিল।

হ্যাঁ, নাম তার দেবতা রায়। গাঁয়ের স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে আমি যখন কলকাতার কলেজে পড়তে আসি, তখন তার সাথে আমার পরিচয় হয়। কলেজের নামকরা ধারালো ছেলে ছিল সে—

স্কলারশিপ পেয়ে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। বেশ বুদ্ধিদীপ্ত সপ্রতিভ চেহারা তার। শুধু পড়াশুনোতেই যে সে সকলের থেকে এগিয়ে থাকত তা নয়, খেলাধূলো, গানবাজনা, সবেতেই ছিল তার সমান আগ্রহ। বুদ্ধিবৃত্তির দিক দিয়ে আমি তার কাছে নগণ্য ছিলাম, তাই তার সাথে আমার বন্ধুত্ব কোন কালেই জমাট বাঁধে নি। সে যে মিশতে চাইতনা তা নয়, আমিই সঙ্কোচে রইতাম দূরে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলারশিপ্ নিয়ে দেবতা রায় ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করলে আব আমি ইণ্টারমিডিয়েট ফেল কবে পড়াশুনো ছেড়ে দিলাম। এব পর থেকে ওব সঙ্গে আমাব আর দেখা হয়নি বটে, কিন্তু ওর অনেক খবরই আসত কানে। ব. এ. পাশ করে সে বিলেত গেল ব্যাবিষ্টারী পড়তে আর কিছু দিনেব মধ্যেই পাশ কবে সে ফিরে এল। তার বাবাও ছিলেন কলকাতার এক নামী ব্যারিষ্টার। কতকটা তাব সাহায্যে, আর কতকটা নিজেব চেষ্টায়, অল্পদিনেব মধ্যেই এমন পশার সে জমিয়ে তুলল যা অনেকেব মনই ভবে দিত ঈর্ষায়। এর কিছুদিন পবে শুনলাম দেবতা বায় হঠাৎ বাড়ী ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে—কি কারণে তা জানা গেল না। এবপব অনেক বছরই কেটে গেছে। সেই উদীয়মান তরুণ ব্যাবিষ্টাবকে আজ এক নগণ্য চা-বাগানেব ম্যানেজাবে পবিণতি পেতে দেখা সত্যিই অভাবনীয়। মনে এ কথাই জাগে যে the truth is stranger than fiction –জীবনে সত্য অনেক সময়ই কল্পনাব চেয়েও আশ্চর্যকর।

পবের দিন যতীন বাবু আমায় চার্জ বুঝিয়ে বিদায় নিলেন। সন্ধ্যা বেলায় ট্রেন এলে পাগলা সায়েবকে আবার দেখা গেল লণ্ঠন হাতে স্টেশনে। তার সঙ্গে কথা কইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সে সময়ে আমার কাজের চাপ সবচেয়ে বেশী। সুতবাং ট্রেন ছাড়া অবধি অপেক্ষা করাই সমীচিন বোধ করলাম। পাগলা সায়েবও তখন ভারি ব্যস্ত ট্রেন পরিক্রমার কাজে। ট্রেন ছেড়ে দিলে আর তাকে

দেখা গেল না। বুঝলাম, সে আর আমার সঙ্গে আলাপ করতে চায় না—স্টেশনের খোলা দিক দিয়ে বেরিয়ে চলে গেছে সে।

পয়েণ্টসম্যান রামনিবাসকে জিগ্যেস করলাম। পাগলা সায়েব সম্বন্ধে। শুনলাম, পাগলা সায়েব এখানকার চা-বাগানের ম্যানেজারী করে আর একলাই এখানে থাকে সে চা-বাগানের মাঝখানে এক বাংলোতে। তাকে লোকে 'পাগলা সায়েব" বলে ডাকে এই কারণে, সে যা কিছু করে সবই খেয়ালের ঝোঁকে। যখন তার কাজ করার খেয়াল হয় তখন খাটে সে ভূতের মতন। একটা সোলার হ্যাট পরে, রোদ বৃষ্টি মাথায় নিয়ে, চায়ের বাগানে বাগানে করে সে কাজের তদারক—এক নাগাড়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি। আর যখন সে খেয়াল চলে যায়, তখন কোথায় যে সে ডুব মারে কয়েকদিন তার কোন পাত্তাই পাওয়া যায় না। আর এক খেযাল তার, ট্রেন এলেই লণ্ঠন হাতে স্টেশনে সে আসবেই। লোকে প্রথম ওকে অদ্ভুত ভাবত, কিন্তু এখন সকলেই তার প্রকৃতি জেনে গেছে, সুতরাং কেউ আর কিছু বলে না।

জায়গাটা শহর আর গ্রামের মাঝামাঝি বলা যেতে পারে। স্টেশনের পাশেই একটা পুরনো গীর্জা আছে। তারই পেছনে খানিকটা জমি নিয়ে খৃষ্টানদের সমাধি স্থান—সারি সারি ক্রুশ বসানো। স্টেশন থেকে যে রাস্তাটা চা-বাগানের দিকে চলে গেছে, সেইটেই এখানকার প্রধান রাস্তা—তার দুপাশে দোকানের সারি। ভেতরে ভেতরে গলিগুলো চলে গেছে জন-মজুরদের বস্তিতে। বেশীর ভাগ ঘরই কাঁচা, তবে কয়েকটি পাকা বাড়ীও আছে। সারা শহর ঘুরে একটা বাঙালিও নজরে পড়লো না—বাঙালিদের মধ্যে তাহলে শুধু আমি আর ঐ পাগলা সায়েব। সুতরাং পাগলা সায়েবের সঙ্গে আলাপ করাটা আমার অপরিহার্য হয়ে উঠল।

একদিন ধাওয়া করলাম তার বাড়ী। চা-বাগানের মাঝখানে ছবির মতো বাংলোটি। কলকোলাহল একেবারেই নেই। মনে হয় না যে এখানে কেউ বাস করে। দরজায় ধাক্কা দিতেই এক

নেপালী চাকর এসে দরজা খুলে দিলে—বললে, যে বাবু বাড়ী নেই। পরের দিন আবার গেলাম সেখানে—সেই একই জবাব। বুঝলাম এখন চলছে তার অজ্ঞাতবাস পর্ব। তবু তার পরের দিন রাত্রে ডাউন গাড়ী চলে গেলে হাজির হলাম আবার পাগলা সায়েবের বাংলোয়। নেপালী চাকরটা এবার খানিকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে—"আপনার কি জরুরী কাজ আছে ওঁর সঙ্গে ?"

—"জরুরী কাজ না থাকলে কি রোজ এমনি আসি এখানে ?"

—"আপনাকে নিয়ে যেতে পারি বাবুর কাছে, কিন্তু তার জন্য শেষে যেন আমায় দোষ দেবেন না।"

—"তার মানে ?"

সে কথার জবাব না দিয়ে চাকরটা বললে—"আপনি কিন্তু নিজের ইচ্ছেয় যাচ্ছেন—এতে আমার কোন দায়িত্ব নেই।"

—"বেশ, বেশ, আগে নিয়ে চল তো"—অধীর হয়ে আমি বললাম।

—"দাঁড়ান আমি আসছি।"

বাড়ীর ভেতর চলে গেল চাকরটা আর কয়েক মুহূর্ত পরে একটা লণ্ঠন নিয়ে সে বেরিয়ে এল। আমায় পথ দেখিয়ে চলল সে একটা রাস্তা ধরে, যে রাস্তাটা সোজা পাহাড়ের দিকে চলে গেছে। পাহাড়ের কাছে পৌছুতেই শুরু হোল জঙ্গল। দুপাশে শাল, সেগুন, দেবদারু ইত্যাদি নানা জাতীয় গাছ। তাদের শুকনো পাতায় চলাপথ গেছে ঢেকে—চলতে গেলে তা মাড়িয়ে যেতে হয়। ঘন ঝোপগুলোতে ফুটে রয়েছে অজস্র বন্য ফুলের রাশি—তাদের উগ্র গন্ধ সারা বাতাসকে করে রেখেছে মাতাল।

আরও খানিক যেতে, জঙ্গল ফাঁকা হয়ে এল, একটা পাহাড়ি নদীর ধারে। সেই ঘাসের গালচে ঢাকা খোলা জমির উপর একদল পাহাড়ি যুগলনৃত্য করছে আর তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বাঁশী বাজিয়ে চলেছে আমাদের পাগলা সায়েব। এদিকে ওদিকে

ছড়িয়ে আছে অনেক গুলো মাটির ভাঁড়। বলাবাহুল্য তাতে রয়েছে দেশী মদ—সম্ভবতঃ পচানো মহুয়ার রস।

খানিক পরে নাচ-গান থেমে গেল। এক ভাঁড় মদ গলায় ঢেলে অস্থির পদক্ষেপে পাগলা সায়েব এলো আমার কাছে। বললে—

—"কি বন্ধু, কি মনে করে?"

জবাব দিলাম—"এসেছি তোমার সাথে দেখা করতে।"

—"কিন্তু এখানে তো আমার সাথে দেখা করার নিয়ম নেই। আমার সঙ্গে দেখা করার নিয়ম হলো আমার বাংলো, যেখানে আমি চা-বাগানের ম্যানেজার দেবতা রায়, যে সোলার টুপি আর খাটো কোর্তা পরে তদারক করে বেড়ায় কুলিদের কাজ। কিন্তু এখানকার এই রাজ্যে I am the monarch of all I survey, my right there is none to dispute."

—"তিন দিন তোমার বাংলোয় গিয়ে ফিরে এসেছি যে—তাই না এখানে আসা।"

—"তাহলে আমার রাজ্যে তোমার অনধিকার প্রবেশ না হয় মাপ করা গেল। কিন্তু বন্ধু, এখানে অতিথি সৎকারের কোন আয়োজনই নেই। আছে শুধু ভাঁড়ভর্তি দেশী মদ, যা খেতে বোধহয় তোমার প্রবৃত্তি হবে না।"

মাথা নেড়ে জানালাম—"না"

—"এখানে এসেও তাহলে সভ্যতার খোলসটা গায়ে এঁটে রাখতে চাও—কিন্তু কি জন্য? বলতে পার কি লাভ তোমার হয়েছে সারা জীবন নিয়মের দাসত্ব করে?"

—"লাভ হোক আর না হোক, অন্ততঃ ক্ষতি কিছু হয় নি। তোমার মত সব কিছু খুইয়ে জীবনটাকে নষ্ট আমি করিনি।"

হা হা করে হেসে উঠল দেবতা রায়। হাসি থামলে সে বললে—"যে জীবনে কোন কিছু হারায় নি, সে কিছু পায়ও নি। যে সব কিছু হারিয়েছে, তারই জন্য তো আছে এই সব-পেয়েছির দেশ—আমার

এই রাজত্ব। এখানে নেই কোন রেশারেশি, নেই কোন হানাহানি, নেই পরস্পরের মধ্যে তুচ্ছ ঈর্ষা আর আত্মকলহ। এক টুকরো রুটির জন্য এখানে মনুষ্যত্ব বিক্রয় করতে হয় না, না একজনের মুখের গ্রাস আর এক জনে ছিনিয়ে নেয়। এখানে আছে ওপরের ঐ খোলা আকাশ, খামখেয়ালী দমকা বাতাস আর ঘন সবুজ বন—আধুনিক সভ্যতার মাপকাঠিতে যার কোন দামই নেই। তাই আমার মাপকাঠিতেও আধুনিক সভ্যতার কোন দাম নেই।"

—"কিন্তু এই কি জীবনের সব?"

—"নয় কেন? মানুষ জীবনে চায় কি? সে চায় সুখ। আমি এখানেই খুঁজে পেয়েছি অন্তহীন সুখের খনি। তবে আমার আর চাইবার কি আছে? যাক্, এ নিয়ে আলোচনা করা বৃথা, কারণ এসব কথা তুমি বুঝবে না, যতক্ষণ সংস্কারের রঙিন চশমা রয়েছে তোমার চোখে। তার চাইতে চল আমার সঙ্গে—

—"কোথায়?"

—"সব পেয়েছির দেশের রাজসভায়। যদি অতিথিকে রাজ সভায় না নিয়ে যাই, তবে আমি কিসের রাজা?"

বুঝলাম আপত্তি করা বৃথা। পাগলের পাল্লায় যখন পড়েছি, তখন সারা রাত তার সাথেই ঘুরতে হবে। সামনের উঁচু পাহাড়টার গা বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল পাগলা সায়েব। আমিও তার পিছু পিছু চললাম। যতই ওপরে উঠতে লাগলাম, ততই বিরল হয়ে আসতে লাগল গাছপালা। এক অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ শীতল হাওয়া সারা দেহমনকে যেন জুড়িয়ে দিতে লাগল। তখন গ্রীষ্মের শেষ। নব-বর্ষার প্রথম মেঘ সবে দেখা দিয়েছে আকাশের গায়ে। মত্তমাতঙ্গের মতো তারা সারা আকাশে ছোটাছুটি করছিল আর চাঁদের সাথে খেলছিল লুকোচুরী খেলা।

পাহাড়ের চূড়ায় যখন উঠলাম, চোখের সামনে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য উদঘটিত হয়ে উঠল। সামনে, পেছনে, পাশে, যেদিকে চাই শুধু

পাহাড়ের পর পাহাড়—দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। পাহাড়ের গায়ে ঘন বন আর তার তলায় চাষ করা খেত। দূরের লোকবসতিগুলো তাসের বাড়ির মতো দেখাচ্ছিল। চাঁদের আলোর মায়াপরশে সারা জগৎটাকে মনে হচ্ছিল একটা স্বপ্নের মতো, একটা ছবির মতো।

“এই আমার রাজসভা” পাগলা সায়েব বললে, ‘আর ঐ আমার রাজ সিংহাসন। চলো গিয়ে বসা যাক।”

একটা প্রকাণ্ড পাথর চূড়ার একদিক থেকে বাইরে ঝুঁকে আছে, দেখতে অনেকটা একটা জল-চৌকির মতন। তার ওপরে আমরা দুজনে গিয়ে বসলাম।

পাগলা সায়েব সুধালে—“বল বন্ধু, কেমন লাগছে আমার রাজত্ব?”

—“সত্যি ভারি সুন্দর জায়গা”—তার দিকে তাকিয়ে আমি বললাম।

—“আশ্চর্য্য নয় যে দুনিয়ায় এমন সুন্দর জায়গা থাকতে পারে?”

—“আমার তো আরও আশ্চর্য্য লাগে তোমাকে! যত তোমায় দেখছি ততই আশ্চর্য হচ্ছি আমি।”

—“হুঁ, আশ্চর্য লাগবারই তো কথা। যে নিজের জমিয়ে তোলা প্র্যাক্‌টিস এক কথায় ছেড়ে এখানে চলে আসতে পারে, যে জংলী পাহাড়ীদের সঙ্গে মাদল বাজিয়ে নাচে, যে স্টেশনে গাড়ি এলেই লণ্ঠন হাতে সেখানে হাজির হয়, সে একজন অদ্ভুত লোক তাতে সন্দেহ নেই।”

—“সত্যি এসব রহস্যের কোন মীমাংসাই আমি করে উঠতে পারি নি।”

—“আর তাই জানতে তোমার কৌতূহল আর বাগ মানছে না। তা নইলে, এত পাহাড়-জঙ্গল পেরিয়ে তুমি আমার কাছে

হাজির হতে না। হুঁ, আজ রাতে তুমি আমার অতিথি। তোমার কৌতূহল চরিতার্থই হোক তাহলে আমার অতিথি সৎকার।"

—"তাহলে অলমতি বিস্তারেন। শুরু কর তোমার কাহিনী।"

পাগলা সায়েব খানিকটা মদ গলায় ঢেলে বললে—

—"শোন বলি, আজ অনেকদিন আগেকার কথা। বসেছিলাম আমি কলকাতায় এক পার্কের নিরালা কোণে। ছাড়া ছাড়া মেঘে ছেয়ে গিয়েছিল সারা আকাশটা, যা আমার চোখের সামনে ধীরে ধীরে ঢাকা পড়ল অন্ধকারের কালো কার্পেটে। খানিকক্ষণের মধ্যেই, আশপাশের বাড়ীগুলোতে জ্বলে উঠল ইলেকট্রিকের দীপমালা আর তার প্রতিফলনে ঝল্‌মল্‌ করে উঠল পুকুরের স্বচ্ছ জল। শুকনো পাতা-গুলো মড় মড় করে উঠছিল শীতের জোরালো হাওয়ায়, যাতে ভেসে আসছিল দূরের বাড়ী থেকে অর্গানের মিষ্টি সুর।

পাইপটা বার করে তাতে অগ্নি সংযোগ করতে যাচ্ছি, এমন সময় চমকে উঠলাম একটা মেয়ের গলার আওয়াজে।

"আমায় কিছু সাহায্য করতে পারেন মিস্টার?" মেয়েটি বললে, আজ "সারাদিন আমি খেতে পাইনি।"

চেয়ে দেখি, আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটি ১৮৷২০ বছরের এংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে। খালি পা, পরণে আধময়লা একটা স্কার্টস্ মাথার রুক্ষ সোনালী চুলগুলো কাঁধ অবধি পড়েছে।

পকেট হাতড়ে ব্যাগটা বার করলাম। ঝেড়েঝুড়ে দেখি, তাতে পড়ে আছে শুধু একটা সিকি। মুদ্রাটা তার হাতে দিয়ে বললাম—"এ ছাড়া আর কিছুই নেই আমার কাছে—আমায় মাপ কর।"

—"একটু বসতে পারি বেঞ্চে?"

—"অনায়াসে।"

"—আজ সারাদিন ঘুরেছি পথে পথে," পাশে বসে আমার দিকে তাকিয়ে মেয়েটি বললে, "কোথাও এতটুকু সাহায্য আমি পাই নি।

আপনার কাছেই যা পেলাম এখন। খুব ভাল করে জেনে গেছি এখন টাকা কি জিনিস জগতে আর কি তার দাম!"

—"কেন এতদিন কি তা জানতে না?"

—"সে জানবার মতো সময় এতদিন আমার আসে নি। আমার বাবা-মা হঠাৎ মারা যাবার পরই না আমায় দাঁড়াতে হয়েছে পথে। আমার বাবা-মা ছিলেন আমার একমাত্র আত্মীয়, একমাত্র আশ্রয় আর ভরসা। ভগবানের খেয়ালে তাঁরা কোথায় হারিয়ে গেছেন জানি না। তবু বছরে দুবার তাঁদের সমাধি-স্থানে যাই। মনে হয় যেন সেখানে তাঁদের দেখা পাই। সেটা সত্যি না মনের ভুল—কে বলবে?"

"—কোথায় আছ এখন?"

—"এক দুরসম্পর্কের কাকার কাছে। আমার কাকা কি রকম লোক জানেন? একটা শয়তান! আমায় কি সব করতে বলে জানেন? যা কোন ভদ্রলোকের মেয়ে করতে পারে না। আর রাজী না হলে তার সাজা কি জানেন? একটা ঘোড়ার হাণ্টার (চাবুক) দিয়ে সপাসপ্ মেরে চলে সে যতক্ষণ তার খুশী। এই দেখুন না হাতটা—"

চেয়ে দেখি তার হাতের উপর চার পাঁচটা কাটা কাটা দাগ—শাদা চামড়ার উপর লাল হয়ে ফুটে রয়েছে।

"কাল সারাদিন কিছু খেতে দেয়নি আমায়। আজও খাবার বন্ধ। তাই মরিয়া হয়ে ঠিক করলাম একটা কিছু করতেই হবে আমাকে। নিজের ব্যবস্থা নিজে না করলে কেউ করতে পারে না। কিন্তু মানুষ যা ভাবে, তা কি কখনও হয়?"

লক্ষ্য করলাম মেয়েটি শীতে কাঁপছে। বললাম—"কাঁপছ যে শীতে? গরম জামা নেই?"

"না, কে আমায় আর দেবে বলুন গরম জামা?"

কি মনে হলো, বললাম—"চল কিনে দি একটা ওভারকোট।"

—"কিন্তু আপনার ব্যাগেতো কোন পয়সা নেই যে। সত্যি, কি ভুলো আপনি!"

—"তার জন্য কোন ভাবনা নেই তোমার। দোকানদারের সঙ্গে আমার চেনা আছে।"

"আপনার দয়া কখনও ভুলব না মিষ্টার।"

দোকান থেকে ওভারকোট কিনে আমরা বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। তখন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। বৃষ্টি সিক্ত জন-বিরল ফুটপাতের উপর ল্যাম্পপোষ্টের বাতিগুলো সৃষ্টিকরেছিল এক একটা আলোর বৃত্ত। ওপরে মেঘে ঢাকা আকাশে জমাট বেঁধে ছিল নিকষ কালো অন্ধকার।

কিন্তু কোন দিকেই হুঁশ ছিল না আমার তখন। একটা আলাদা জগতে ছিলাম যেন আমি সে সময়ে। আমরা দুজনে হেঁটে চলছিলাম পাশাপাশি। আমার হাতে ছিল তার হাত, আমার দৃষ্টি ছিল তার মুখের উপর।

—"তোমায় ভারি সুন্দর মানিয়েছে কিন্তু," আমি বলি, "ওভার কোটটা সার্থক হয়েছে তোমার গায়ে চড়ে।"

—"সে আপনার দয়া।"

—"আমাদের জন্যই বৃষ্টি রাস্তাটা ফাঁকা করে রেখেছে আজ। এই বৃষ্টি-ধোওয়া রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছি শুধু আমরা দুজনে ; আজ এই সুন্দর সন্ধ্যায় মনে হচ্ছে যেন এক স্বপ্ন রাজ্যের পথ দিয়ে চলেছি আমরা।"

—"আর আমার কি মনে হচ্ছে জান!" মেয়েটি জবাব দিলে, "মনে হচ্ছে তুমি যেন আমার কত নিকট, কত আপনার। কাল তোমায় আমি চিনতাম না ; কিন্তু আজ মনে হচ্ছে এই জগতে তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়।"

হঠাৎ একটা গলির মুখে এসে মেয়েটি থমকে দাঁড়াল। দূরে একটা অন্ধকার ঢড়ঢড়ে বাড়ীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে সে বললে— "ঐ আমার কাকার বাড়ী।"

—"আজ ভেবেছিলাম," মেয়েটি বললে, "যে কাকার কাছে আর ফিরে যাব না আমি। কিন্তু এখন দেখছি না ফিরলে আর উপায় নেই। বিশাল এই জগৎ আর নগণ্য আমি এখানে, কোথায় খুঁজে পাব আমি আশ্রয়, আর কি নিয়ে দাঁড়াব আমি জীবনে?"

—"শোন, আজ তুমি ফিরে যাও তোমার কাকার কাছে," আমি বলি, "একদিন কোন রকমে কাটাও ওখানে। তারপর কাল পার্কে আমার সঙ্গে দেখা করো। আশ্রয়ের জন্য তোমায় ভাবতে হবে না, সে ভার আমি নিলাম। কোথাও যদি না মেলে, আমার কাছে রয়েছে তো তোমার আশ্রয়।"

"তোমার দয়া অসীম—Good night"—আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মেয়েটি ঢুকে পড়ল গলিতে। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে তার দিকে চেয়ে, যতক্ষণ দেখা গেল তাকে।

পরের দিন সন্ধ্যায় পার্কে ঢুকে দেখি, সে মেয়েটি বসে আছে বেঞ্চিতে। আমি এসে তার পাশে বসলাম।

—"আমি কাল সারারাত কি ভেবেছি জান?" মেয়েটি বললে আমায়, "এত বড় লোক তুমি—"

—"তুমি কি করে তা জানলে?"

—"আর শহরের এতবড় নামজাদা ব্যারিষ্টার—"

—"সে খবরও রাখ দেখছি তুমি।"

—"হাঁ, আর একজন অতি সামান্য মেয়ে আমি। অথচ আমার ওপরই এত দয়া কেন তোমার?"

—"সত্য কথা বলব, বিশ্বাস করবে?"

—"বলো"

"তার কারণ হচ্ছে এই যে আমি তোমায় ভালবাসি। আমার জীবনের সবকিছুর চেয়ে ভালবাসি আমি তোমায়। বলো, এ জীবনে তোমায় কি আমি পাব?"

দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে আমার বুকে মুখ গুঁজল মেয়েটি।

তারপর চাপা অস্ফুট গলায় সে বললে—"এখনো কি তুমি বোঝনি, আমি তোমার, শুধু তোমারি।"

হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে উঠল একটা ফ্ল্যাশ্ লাইট্। তারপরেই ক্যামেরা হাতে পাশের ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল একজন বুড়ো এংলো-ইণ্ডিয়ান। গালের মাংসগুলো তার ঝুলে পড়েছে বার্দ্ধক্যে। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ—একটা পরিপক্ক চাতুর্যের ছাপ রয়েছে তার সারা মুখে "Excuse me sir," সেই এংলো ইণ্ডিয়ান বুড়োটা বললে, —"আমি একজন ফটোগ্রাফার। আপনাদের সুন্দর pose টা দেখে ফটো নেবার লোভ আমি সামলাতে পারলাম না। ম্যাগাজিনে ছাপা হলে একটা কপি পাঠিয়ে দেব আপনাকে।"

—"এ ফটো আপনি ছাপবেন নাকি ?"

"যদি আপনার এতে আপত্তি থাকে, তাহলে না হয় ছাপাব না। তবে বুঝতেই পারছেন, আমি একজন গরীব লোক। কিছু মাসোয়ারা যদি আপনি দেন—"

—"ফটো নিয়ে ছাপাতে হয় ছাপান, যা করবার হয় করুন—I don't care। এক পয়সাও আমি দেব না।"

বেঞ্চ ছেড়ে উঠে এলাম আমি। পার্কের গেট দিয়ে বেরুতে যাচ্ছি, এমন সময় কোটের পেছনে পড়ল একটা টান। পেছন ফিরে দেখি, দাঁড়িয়ে আছে সেই মেয়েটি।

—"কি ব্যাপার আবার—কি চাও তুমি ?" কঠোর কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম আমি।

—"আমায় মাপ করো," মেয়েটি বললে, "এই আমার পেশা—ঐ লোকটাই আমার কাকা।"

একে হৃদয়হীন প্রেমের অভিনয়, তার উপর আবার এই ঢঙ। আমি আর থাকতে পারলাম না। ঠাস্ করে বসিয়ে দিলাম তার গালে একটা চড়। তারপর সোজা বেরিয়ে এলাম পার্ক থেকে। পেছনে কানে এল একটা চাপা কান্নার আওয়াজ, যাকে মনে হচ্ছিল

অনেকটা চাপা হাসির মতো। ফিরে দেখার আর প্রবৃত্তি হোল না আমার।

পরের দিন সকালে পেলাম এক ছোট্ট চিঠি। শুধু এই কটি কথা লেখা ছিল তাতে—

—"হয় তো তুমি বিশ্বাস করবে না, কিন্তু সত্যিই আমি তোমায় ভালবেসেছিলাম। মানুষ নিজেকেও এতটা ভালবাসে না, যতটা আমি ভালবেসেছিলাম তোমায়। কিন্তু শয়তান চেপেছিল আমার কাঁধে, যার গতিরোধ করা ছিল আমার দুঃসাধ্য। এ জীবনে তোমার সঙ্গে আমার আর মিলন হতে পারে না। তোমার চোখের সে ঘৃণাভরা দৃষ্টি, তোমার মুখের সে কঠিন অবজ্ঞার রেখা, এখনও ভাসছে আমার চোখের সামনে। যদি কোন দিন নিজেকে ফিরে পাই জীবনে, তাহলে তোমার সঙ্গে হয়তো আবার দেখা হবে। অ্যালিস্।"

চিঠিটা পেয়ে চুপচাপ বসে রইলাম আমি খানিকক্ষণ। হঠাৎ মনে হোল, যে এখনও তো আমি তেমনি ভালবাসি অ্যালিসকে, যেমন ভালবেসেছিলাম তাকে আগে। এতটা ভাল না বাসলে, এতখানি ঘৃণা আর অবজ্ঞা তাকে করতে পারতাম না আমি কখনও। শুধু তারই ওপর করা চলে অভিমান, যাকে ভেবেছি আমার আপন; শুধু তারই ওপব রাগ করা যায়, যাকে দিয়েছি আমার মন। আমায় ভালবেসে, আমারি জন্যে অ্যালিস আজ হারিয়ে গেছে। হায়, এ জীবন দিয়েও যদি তার প্রায়শ্চিত্ত্য করতে পারতাম!

আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। তখুনি ছুটলাম অ্যালিসের কাকার বাড়ী। শুনলাম কাল রাতে অ্যালিস বাড়ী ফেরে নি, আজ সকালেও তার কোন খোঁজ নেই। খবরের কাগজ তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম, কিন্তু না পেলাম কোন এংলোইণ্ডিয়ান মেয়ের আত্মহত্যার কাহিনী, না কারও মৃতদেহ আবিষ্কারের কথা।

তারপর কয়েকদিন দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ালাম কলকাতার পথেঘাটে হোটেলে, রেষ্টুরেণ্টে—কিন্তু যার জন্য এত খোঁজ তার সন্ধান

পেলাম না। বেশীদিন আর ভাল লাগল না কলকাতায়—বেরিয়ে পড়লাম দেশভ্রমণে। ঘুরলাম অনেক জায়গায়—দিল্লী, বম্বে, মাদ্রাজ, ত্রিচিনোপল্লী। তারপর আবার ফিরে এলাম নিজের বাড়ীতে। ফিরে এলাম, কিন্তু নিজের মনকে ফিরে পেলাম কোথায়? যাকে ভুলতে চাই তাকে ভুলতে পারলাম কৈ? কলকাতায় আর নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে পারলাম না—পারলাম না সেখানে তিষ্ঠুতে। শেষে এখানে চা-বাগানের ম্যানেজারের চাকরী নিয়ে চলে এলাম। সেই থেকে এখানেই আছি। তারপর অনেক বছর কেটে গেছে।

এখানকার সমাধিক্ষেত্রে আছে অ্যালিসের বাবা-মার সমাধি। অ্যালিসের বাবা ছিলেন রেলের ইঞ্জিনিয়ার। এই ব্রাঞ্চলাইন পাতার কাজে তাঁকে এখানে পাঠান হয়েছিল। ডাইনামাইট ফাটিয়ে টানেল তৈরী করার সময় বিস্ফোরণে তাঁর মৃত্যু হয়। অ্যালিসের মা তার অনেক দিন পরে মারা যান। তাঁর শেষ ইচ্ছা ছিল, স্বামীর সমাধির পাশে তাঁকে যেন শোওয়ানো হয়। অ্যালিস বলেছিল বছরে দুবার সে আসে বাবা-মা-র সমাধি দর্শনে। কিন্তু বছরের পর বছর কেটে গেল—সে দুদিন আমার জীবনে আর এল না।

কিন্তু আজও তার দেখা পাবার আশা মন থেকে যায় নি। আজও মনে হয় তার দেখা মিলবেই আর সেদিন উজাড় করে বলব তাকে, এ মনে জমা আছে যত কথা। স্টেশনে যখন গাড়ি আসে, পাগলের মতো ছুটে যাই তাকে দেখতে। কিন্তু হায়, এ তৃষিত আঁখি তৃষিতই রয়ে যায়।

—"আর যদি এ জীবনে তার দেখা না পাও?" প্রশ্ন করলাম আমি।

—"তাহলেও এ জীবন আমার ব্যর্থ হবে না" সে জবাব দিলে, "On earth the broken arcs, in heaven a perfect round (এ জগতের খণ্ডিত বক্র রেখা, ও জগতে হয় পরিপূর্ণ বৃত্ত।)"*

*ভবানীপুর রবীন্দ্র শত বার্ষিকী উৎসবে ছোটগল্প প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্ত

হলদে ঝিনুক

নদীর ধারটায় সার্কাসের তাঁবু পড়েছে। বিরাট তাঁবুর ভেতর দর্শকদের গ্যালারি সাজান হয়েছে। এসেছে খাঁচায় করে বাঘ, সিংহ, ভালুক, শিম্পাঞ্জি, এসেছে কত লোহালক্কড়, দড়িদড়া আর কাঠের স্তূপ।

সন্ধ্যেরদিকে টিকিটের লাইনটা শম্বুক গতিতে এগুচ্ছিল। প্রায় আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে একটা টিকিট পাওয়া গেল।

ভেতরে ঢুকে দেখি, গ্যালারি প্রায় ভর্তি। শুধু শহরের নয়, দূরের গ্রাম থেকে, শহরের উপকণ্ঠ থেকে দর্শকরা এসে জুটেছে। যাত্রা কিংবা পালাগান হলে যে শ্রেণীর জনসমাগম হতো, গ্যালারিতেও তার কিছু ব্যতিক্রম নেই। তবে আসর জমিয়ে রেখেছে ছোট ছেলে-মেয়েরা। তারা একজোটে বসে অনর্গল কথা বলে চলেছে আর সার্কাসের জন্তুদের দেখছে।

বাঁশী বেজে উঠল। খেলা সুরু হোল। প্রথমে জীবজন্তুর খেলা। হাতি ঘোড়া আর শিম্পাঞ্জির কসরৎ। ছড়ি হাতে একটা ক্লাউন আদ্যন্ত খেলাগুলি পরিচালনা করলে। তারপর তারের খেলা। পুতুলের মতো অদ্ভুত ধরনের ফ্রক পরা সবমেয়ে হাতে জাপানী ছাতা নিয়ে, তারের উপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে হেঁটে গেল। এরপর সাইকেল, এক চাকার সাইকেল, আগুনের খেলা এবং সমস্ত কিছু পার হয়ে যখন ট্রাপিজের খেলা সুরু হোল, তখন সকলে রুদ্ধ-নিঃশ্বাস হয়ে বসল।

অনেক উর্দ্ধে দুখানা দোলনা দুলছে—ঠিক দোলনা নয়, দুখানা মসৃণ উজ্জ্বল ধাতুখণ্ড। আর তা ধরে বাদুড়ের মতো ঝুলছে একটি লোক। লোকটার চেহারা লম্বা, ছিপছিপে, গায়ে আঁট সাঁট পোষাক

আর গলায় দুলছে একটা হার—যার লকেটের জায়গায় একটা প্রকাণ্ড হলদে রঙের ঝিনুক আঁটা আছে।

সমান্তরাল বার দুটি দুলছে—সামনে পেছনে। সামনে যখন আসছে, তখন পরস্পর অত্যন্ত কাছাকাছি আসছে। পরমুহূর্তে আবার দূরে সরে যাচ্ছে, তাদের ব্যবধান বেড়ে যাচ্ছে। নীচে মাটির উপর টান টান করে জাল টাঙ্গান।

শুরু হোল খেলা। কখনও দড়ি বেয়ে তাঁবুর টঙে ওঠা, কখনও দড়ি ছেড়ে লাফিয়ে বারটা ধরা কখনও এক হাতে বারটা ধরে ঝুলে থাকা আর কখনও বা একটা বার থেকে লাফিয়ে পড়ে আর একটা বার ধরা। এই লোমহর্ষণ খেলা চলল অনেকক্ষণ ধরে, তারপর শেষ হলো সার্কাস।

কৌতূহলের নিবৃত্তি হোল না আমার। বিশেষ করে হলদে রঙের ঝিনুকের মালা পরা ট্রাপিজের লোকটাকে বার বার মনে পড়তে লাগল। তাই পরের দিন সকালে আবার গেলাম নদীর ধারে, যেখানে সার্কাসের তাঁবু খাটান হয়েছে।

সার্কাসের মেয়ে পুরুষ হরেক সাজে, হরেক কাজে, ইতি উতি ছড়িয়ে রয়েছে। তাঁবুর সামনেই কয়েকটি মেয়ে দাঁড়িয়ে, নাচের ভঙ্গিতে চলে-বেড়িয়ে অনেকক্ষণ থেকে গল্প করছিল। অফুরন্ত তাদের হাসি, অনর্গল তাদের গল্প। আমি কাছে যেতেই হাসি থেমে গেল ওদের, চোখ বড় বড় হলো আর তারপর কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে থেকে তাঁবুর ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রমীলা বাহিনীর আকস্মিক রণভঙ্গে আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। পরমুহূর্তে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল যে মোটা আধবুড়ো লোকটি, তাকে চিনলাম সার্কাসের ক্লাউন বলে।

ক্লাউন বললে—"এখন তো খেলার সময় নয়। কাকে চাই বলুন?"

জবাব দিলাম—"কালকে ট্রাপিজের খেলা দেখাচ্ছিল যে লোকটি তার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।"

ক্লাউন গলা চড়িয়ে ডাকল—"চাকো,এস এখানে।"

ট্রাপিজের সেই লোকটি বেরিয়ে এল। গলায় তখনও তার ঝিনুকের হার। আমি বললাম—"এমন সুন্দর ট্রাপিজের খেলা শিখলেন কোথায় ?"

চাকো বললে—"কেরালায়—এই সার্কাসের ট্রেনিং-এ। আমরা সার্কাসের লোক বেশীর ভাগই কেরালার। আমার বাবা জেলে, আমিও ছিলাম তাই--তবে টাকার জন্য সার্কাসে এসে জুটেছি।

"এ খেলায় কত বিপদ আছে জানেন না।"

—"জানি বাবু, বিপদে পড়েছিও বটে। তবে সব বিপদ থেকে বাঁচিয়েছে আমায় এই হলদে ঝিনুকটা।"

—"তাই নাকি ?"

—"এর পেছনে একটি ছোট্ট গল্প আছে। যদি আপনার শোনার ইচ্ছা থাকে তো বলতে পারি।"

আমি মাথাটা নাড়লাম।

—"আগেই বলেছি আমি কেরল দেশের, পেশায় জেলে। সমুদ্রের নোনা জল আমার রক্তে মিশে আছে। সমুদ্রের অনেক ঝড় আমি দেখেছি, আবার চাঁদের আলোয় উৎফুল্ল সমুদ্রের মর্মর তানও শুনেছি। কেরলের কুইলন শহরের কাছে সমুদ্রের ধারে আমাদের বাড়ী ছিল। ছেলেবেলা থেকেই ডিঙ্গিতে বাবার সঙ্গে মাছ ধরতে যেতাম। সে মাছ বিক্রি হোত সারা সকাল, সারা দুপুর। কিছু মাছ শুঁটকি করে রাখা হতো।

সন্ধ্যা বেলায় সমুদ্রের ধারে বেড়াতাম। আমার খেলার সঙ্গী ছিল চিনাম্মা নামে একটি ছোট্ট মেয়ে। খেলতে খেলতে আকাশ লাল করে সূর্য অস্ত যেত, সমুদ্রের আবির গোলা জল শত তরঙ্গে নাচত আর যেখানে দিগন্ত এসে সমুদ্রে মিশেছে, সেখানে টুপ করে সূর্য ডুবে যেত।

চিনাম্মাও জেলের মেয়ে। কিন্তু একদিন তার বাবা যখন ডিঙ্গি

করে মাছ ধরতে গেলেন, তখন আকাশ ছিল মেঘলা। চিনাম্মার বাবা নৌকা করে অনেকদূর গিয়েছিলেন। এমন সময় ঝড় উঠল সোঁ সোঁ করে। তীরবেগে বৃষ্টির ধারা নেমে এল আর ঢেউগুলো উতাল-পাতাল করে সৈকতে আছড়ে পড়তে লাগল। সারা দিন, সারা রাত, ঝড় চলল। চিনাম্মার বাবার কি হল জানি না—কিন্তু তিনি আর ফিরে এলেন না। তখন চিনাম্মার বয়স মাত্র দু'বছর।

চিনাম্মার সংসারে দেখবার লোক কেউ ছিল না। চিনাম্মার মা আশ্রয় নিলেন তাঁর বাবার কাছে। চিনাম্মার দাদু কুইলন শহরের বাসিন্দা। তিনি জেলে নন,—কাঠের ব্যবসায়ী। তাঁর অবস্থা কিছুটা ভাল। সেখানেই পিতৃহারা চিনাম্মা মানুষ হতে লাগল।

আমি আর চিনাম্মা দৌড়াদৌড়ি করে লুকোচুরি খেলা করতাম সমুদ্রতীরে নারকেল গাছের আড়ালে। কখনও আমরা ভিজে বালি দিয়ে ঘর তৈরী করতাম। চিনাম্মার তৈরী ঘরগুলো হতো অতি সুন্দর—সে যেন ঐটুকু বয়সেই ঘরণী। চিনাম্মা সমুদ্রের তীরে ঝিনুক কুড়াত আর নানা রঙের, নানা আকৃতির, নানা প্রকৃতির ঝিনুকগুলি জমিয়ে রাখত। আমিও ঐ শখটা চিনাম্মার কাছ থেকে শিখেছিলাম। আমরা আমাদের ঝিনুক বদলা-বদলি করতাম। একটা ভাল ঝিনুকের বদল হতো দুটো কি তিনটে অন্য ঝিনুক দিয়ে। চিনাম্মা একটা বড় হলদে রঙের ঝিনুক কুড়িয়ে পেয়েছিল। ঝিনুকটা অদ্ভুত সুন্দর। যেমন বড় আর তেমনি চিক্কণ আর মসৃণ। ঝিনুকের পিঠটা গাঢ় হলদে রঙের—অন্য কোন রঙ নেই তাতে। ঠিক একটা হলদে গোলাপের পাপড়ির মতো। আমার লোভ ছিল ঐ ঝিনুকটা পাবার। কিন্তু চিনাম্মা কিছুতেই সে ঝিনুক কাছ ছাড়া করত না। ঐ ঝিনুকের বদলে অন্য ঝিনুক দিতে চাইলে চিনাম্মা মাথা নেড়ে বলত—"একশটা ঝিনুক পেলেও এ ঝিনুক আমি ছাড়ব না। এ ঝিনুক আমারই থাকবে।"

একদিন খেলতে খেলতে দেরী হয়ে গেল। মস্ত বড় চাঁদ উঠেছিল আকাশে, সমুদ্রের জল আলোয় ঝল্‌মল্‌ করছিল, হু হু করে নারকেল

গাছের মাথায় দোল দিয়ে বইছিল সমুদ্রের হাওয়া। আমি চিনাম্মাকে বললাম—"আমি তো গরীব জেলে চিনাম্মা আর তোমার দাদু কাঠের ব্যবসা করেন। সমুদ্রে ডিঙি নিয়ে আমি রোজ বেরুই আর এমনি করে ঝড়ের সঙ্গে, জলের সঙ্গে লড়াই করে আমার জীবন কাটবে। তোমার দাদু তোমার বিয়ে দেবেন, কত বাজনা বাজবে। সেখানে পাবে নতুন মানুষ, যে তোমার বর হবে। তখন কি আমার সাথে আর খেলবে?

চিনাম্মা বলল—"যাঃ, বিয়ে আমি করবই না। তোমায় ছাড়া আর কাউকে খেলার সাথী আমি চাই না।"

এমনি ভাবে কত দিন কেটে গেছে জানি না। একদিন বিকেলে আমরা খেলা করছি, খেলতে খেলতে হঠাৎ চিনাম্মা বললে—"আমি যদি দূর দেশে চলে যাই, আমায় তুমি কি ভুলে যাবে?

আমি মাথা নেড়ে বললাম—"আমি তোমায় মনে রাখব সব সময় একথা কেন বলছ?"

চিনাম্মা তার অতি প্রিয় হলদে ঝিনুকটা আমার হাতে দিয়ে বললে—"এটা তোমাকে আজ দিলাম। তুমি চেয়েছিলে আগে, তখন দিই নি, কিন্তু এটাকে তুমি হাতছাড়া করো না। আমি যদি চলে যাই, এ ঝিনুকটা দেখে আমার কথা মনে পড়বে।"

এই বলে চিনাম্মা চলে গেল। আমি তার পেছনে দৌড়ে গিয়ে বললাম—"এটা তুমি নিয়ে যাও চিনাম্মা। এটা আমি চাই না।"

চিনাম্মা বললে—"এটা এতদিন আমার কাছে ছিল। এখন তোমাকে দিয়েছি। এটা এখন তোমার।"

দেখি চিনাম্মার চোখদুটো জলে ভরে গেছে। কাঁদতে কাঁদতে সে ছুটে পালাল!

পরের দিন চিনাম্মা খেলতে এলো না। তার পরের দিনও না খবর নিয়ে জানলাম, চিনাম্মার দাদু ব্যবসাপত্র গুটিয়ে জাহাজে করে

চলে গেছেন সিঙ্গাপুর। সেখানে কাঠের ব্যবসায়ে নাকি খুব লাভ আছে। চিনাম্মাও চলে গেছে তার দাদুর সঙ্গে।

আমাদের কেরল দেশের লোকেরা খুব Adventurous হয়—বোধহয় দারিদ্র্যের জন্যে। অনেকে দূরদেশে যায় এমনি করে। অনেকে সার্কাসের কাজে ঢুকে সারা দেশ ঘোরে। অনেকে আবার নাবিক হয়ে সমুদ্রে পাড়ি দেয় বার বার।

চিনাম্মার সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। আমারও আর জেলের কাজ ভাল লাগল না। কিছুদিন পরে আমি সার্কাস পার্টিতে যোগ দিলাম।

অনেক ছোট ছেলে-মেয়েরা একসঙ্গে খেলা-ধূলা করে, যেমন আমি আর চিনাম্মা করেছি। তাতে ভালবাসা হয় কিনা জানি না। কিন্তু আমি আজ পর্যন্ত বিয়ে করি নি। যখনই বিয়ের কথা ভাবি, তখনই মনে পড়ে যায় চিনাম্মার জলভরা দুটি চোখ আর কান্নায় ভেজা কণ্ঠস্বর। আমার আর বিয়ে করা হয়ে ওঠে নি, বাবু।

এই হলদে ঝিনুক আমায় চিনাম্মার কথা ভুলতে দেয় না। এটা হার করে পরেছি, পরে দেখেছি এ আমায় বিপদ থেকেও বাঁচায়—যেন চিনাম্মা তার দুটি সুন্দর হাত দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরে আছে, যার কাছে সব ঝড়-ঝাপ্টা তুচ্ছ হয়ে যায়।

মিস্ বিউটির ইতিকথা

একদিন হঠাৎ আমার বন্ধু সমীর আমায় নেমন্তন্ন করে বসল তার জন্মদিনে। সমীরের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বহুদিনের এবং আলাপ তার চেয়েও বেশী দিনের। কিন্তু তার বাড়ির সঙ্গে কোন পরিচয়ই আমার ছিল না। সুতরাং মহা মুস্কিলে পড়লাম। আমি চিরদিনই একটু মুখচোরা ঘরকুণো ধরনের লোক। বেশী লোকের সঙ্গে মেলামেশা বরদাস্ত হয় না আমার মোটেই। কিন্তু না গিয়ে কোন উপায় ছিল না—সুতরাং যেতে হোল আমায়।

গিয়ে পৌঁছুতেই সমীর আমায় ধরে নিয়ে গেল একেবারে তার বাবার কাছে। সমীরের বাবা মিঃ বোস শহরের একজন নামজাদা ব্যারিষ্টার। মিঃ বোস বিপত্নীক। আধুনিক ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের এক অদ্ভুত সংস্করণ তিনি—মসীকৃষ্ণ দেহের উপর দামী স্যুট চড়িয়ে সেজেছেন যেন এক ময়ূর পুচ্ছ দাঁড়কাক। রেলের এঞ্জিনের মতো তাঁর মুখবিবর থেকে সদাই নির্গত হচ্ছে সিগ্রেটের ধোঁওয়া।

আমার পরিচয় পেয়ে তিনি অদ্ভুত স্বরে বলে উঠলেন—

"হাড্ডু"। তারপর করলেন আমার সাথে হাতাহাতি—তাতে হৃদ্যতার চেয়ে ঝাঁকুনিটাই ছিল বেশী

"সমীরের কাছে প্রায়ই তোমার কথা শুনি" বোস সাহেব বললেন আমায়, "শুনলাম এবার ফাষ্টক্লাশ অনার্স পেয়েছ তুমি বি.এ. পরীক্ষায়। খুব ভাল কথা—why not try for I.A.S. ?"

"চেষ্টা তো করছি, কিন্তু মনে ভরসা পাই না।"

"চেষ্টা করলে কি না হয়," আমায় আশ্বস্ত করেন বোস সাহেব, "where there is a will, there is a way."

বাংলার সাথে ইংরাজীর খিঁচুড়ি কথনই নাকি ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের ভব্যতা।

এই সময় গণ্যমান্য অতিথির আগমনের সংবাদ পেয়ে বোস সাহেব ছুটলেন তাঁদের আপ্যায়নে। আমরাও তাঁর পিছু পিছু নেমে এলাম নীচেকার ড্রইং রুমে। অতিথি-অভ্যাগতে ভর্তি ছিল ঘরটা। ২০।২২ বছরের একটি সুন্দরী যুবতী অর্গানের সামনে বসে গান গাইছিলেন। গান শেষ হলে তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল সমীর। মহিলাটি সমীরের বোন আইরিন। আইরিনের কথাবার্তা মার্জিত, আচার-আচরণ সংযত ; হাসি-কাশি ওজন করা আর সময় মাফিক। এক কথায় বেশ শিক্ষিত কুলাচার সম্পন্ন (cultured) মহিলাই বলা যেতে পারে আইরিনকে।

"ইনি বুঝি তোমার একমাত্র বোন?"—আমি সমীরকে জিজ্ঞেস করলাম।

"মোটেই না—আমাব আর একটি বোন আছে।" এই বলে সমীর উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলে—"বিউটি, বিউটি"। তারপর পুনর্বার পুনরাবৃত্তি করলে সে ডাকের।

"আমার কান আছে দাদা, আমি শুনতে পাই"—ততোধিক উচ্চকণ্ঠে জবাব এলো উপর থেকে। তারপরেই দুম্ দুম্ করে সিড়ি দিয়ে নীচে নেমে এল, যাকে অভিহিত করা হয়েছে বিউটি নামে।

"এটি আমার ছোট বোন," সমীর বললো, "এর নাম মিস্ বিউটি। এর ভাল নাম অবশ্য একটা আছে, তবে তা আমরা ভুলেই গেছি বলতে গেলে।"

সত্যি, বিউটিই বটে। যেমন বেঁটে আর তেমনি মোটা। মেয়েটি সবচেয়ে ছোট বলে বাপের সবচেয়ে আদুরে। এই ধেড়ে বয়সেও স্কার্টস্ পরে ঘুরে বেড়ায় ধিঙ্গি মেয়ের মতন। দিদির সঙ্গে কনভেণ্টে পড়ে—টফি আর চকোলেটের একটি ছোটখাট যম।

ভোজনপর্ব সমাধা হলে আমরা দুই বন্ধুতে সকলের অলক্ষ্যে বেরিয়ে এলাম সেই কোলাহল মুখরিত ড্রইং রুম থেকে। খোলা

মনে একটা বেতের টেবিলের ধারে দুটো বেতের চেয়ার নিয়ে মুখোমুখি বসলাম আমরা দুজনে। তারপর অবাধে চলতে লাগল আমাদের গল্পের স্রোত।

কতক্ষণ পরে ঠিক মনে নেই, হঠাৎ ঠক্ করে একটা আওয়াজ হলো। চেয়ে দেখি আমার সামনে টেবিলের উপর এক পেয়ালা ধুমায়িত কফি আর আমার পাশে দাঁড়িয়ে মিস্ বিউটি স্বয়ং।

"বলুন তো কেমন হয়েছে কফিটা ?"

"খুব ভাল," চুমুক না দিয়েই আমি জবাব দিই।

"চুমুক দিয়েই দেখুন না একটু," একটা চেয়ার টেনে বসে মিস্ বিউটি বললে।

অগত্যা কফিতে চুমুক দিতে হলো আমায়। "বেশ ভালই হয়েছে কফিটা"—কথাটার পুনরাবৃত্তি করলাম আমি।

"বাহবা," হাততালি দিয়ে উঠল মেয়েটি, "আমি জিতেছি।"

"তার মানে ?"

"দিদির সঙ্গে আমার কমপিটিশন হয়েছিল কে ভাল কফি বানাতে পারে।"

"তোমার দিদির তৈরী কফি কোথায় ?"

"দিদি কফি তৈরী করেছে দাদার জন্যে, আর আমার কফি আপনার জন্যে ঐ তো দিদি আসছে।"

আইরিন এসে সমীরের হাতে তুলে দিলে এক কাপ কফি। তারপর আমার দিকে ফিরে সে বললে—"এই পাগলীটা তৈরী করেছে আজ আপনার কফি। কোন কথা শুনলে না। দেখুন তো ঠিক হয়েছে কিনা—নইলে আর এক কাপ তৈরী করে আনি আপনার জন্যে।"

"বলো, কি বলব তোমার দিদিকে ?"—মিস্ বিউটিকে আমি প্রশ্ন করি।

"আপনার যা খুশী"—নির্লিপ্ত উদাসীনতার সঙ্গে জবাব দেয় সে।

"তুমি তৈরী করেছ বলেই ভাল হয়েছে। তাছাড়া কফিটা ভাল হলে তো ভাল বলতেই হবে আব খারাপ হলেও বলতে হবে ভাল।"

"কেন?"

"নইলে তুমি চটে যাবে যে।"

"দাদা বলেছিল আপনি একজন খুব ভাল ছেলে—"

"তাই নাকি, তা এখন তোমার কি ধারণা?"

"আপনি একটা একের নম্বরেব দুষ্ট আব দুয়ের নম্বরের পাজী লোক।"—চেয়ার ছেড়ে উঠে চলে গেল মিস্ বিউটি।

হাতটা আমার নিশ্পিশ্ কবে উঠল। পিঠের উপর প্রলম্বিত তার স্থূল কালো বেণীটা ধরে তাতে মারলাম একটা হেঁচকা টান। স্প্রিং এর মতো গুটিয়ে ফিরে এলো সে আমার কাছে।

ছাড়ুন ছাড়ুন বিনুনীটা, আমাব বুঝি লাগে না—আপনি তো আচ্ছা লোক।"

"আমার কি দোষ বল? তোমার ঐ লম্বা বিনুনীটা দেখলেই আমার টানতে ইচ্ছা করে। বাঁদরের পিঠে যেমন থাকে দেড় হাত লম্বা লেজ, তোমার পিঠে তেমনি ঐ দেড় হাত লম্বা বিনুনী।"

সকলে হেসে উঠল আমার কথা শুনে।

"তাহলে কি বলতে চান আমি একটা বাঁদর?"—রাগত স্বরে বললে মিস্ বিউটি।

"বাঁদর নয় বাঁদরী," সংশোধন করে দিল সমীর, "দেখ্ আমাদের কারুর মাথায় নেই তোর মতো দেড় হাত লম্বা বিনুনী।"

"আহাহা—আর দিদির মাথায় নেই বুঝি?"

"দিদি চুলে খোঁপা বাঁধে—তোর মতো বিনুনী ঝুলিয়ে বেড়ায় না।" সমীর জবাব দিল।

"আচ্ছা মেনে নিচ্ছি, আমি একটা বাঁদরী। তোমরা সবাই মানুষ তো?"

"আমার সঙ্গে তোমরা কেউ কথা বলো না, আলাপ করো না, গপ্প বলো না—একদম না।"

রাগে গরগর করতে করতে চলে যাচ্ছিল মেয়েটা। আমি তার চুলের পুচ্ছাকৃতি গুচ্ছটা ধরে দিলাম আর এক টান।

"আঃ কি করছেন আবার?"—রীতিমতো চোখ পাকিয়ে বললে মিস্ বিউটি।

"আগে একবার হাসো, তারপর যেও।"

"না, আমি হাসব না।"

"তাহলে আমিও ছাড়ব না তোমার বিনুনীটা।"

"মুস্কিল হলো দেখছি," চিন্তিত স্বরে সমীর বললে, "বিউটি তো শুধু জেদী নয়, একেবারে একজেদী। এখন কি করে হয় ফয়সালা?"

"ফয়সালা আমি করে দিচ্ছি"—এই বলে আইরিন দাঁড়াল বিউটির পেছনে। তারপর তার বগলে দুটো হাত দিয়ে সজোরে দিতে লাগল কাতুকুতু। খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল মিস্ বিউটি।

"যাও এবার তুমি—কিন্তু মুখ একদম গোমড়া করে থাকবে না!" —তার বিনুনীটা ছেড়ে দিলাম আমি।

সত্যি, না হাসলে মিস্ বিউটিকে মোটেই মানায় না। কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগে মেয়েটাকে।

এর কিছুদিন পরের কথা। সেদিন দুপুর বেলায় ভাল লাগছিল না আমার মোটেই। তখন ভাবলাম একটু ঘুরে আসা যাক বাইরে। কোথায় যাই? মনে হলো সমীরের কাছে গেলে মন্দ হয় না।

যে কথা সেই কাজ। সমীরের কাছে পৌঁছে দেখি কেমন যেন নিস্তব্ধ ফাঁকা ফাঁকা লাগছে সারা বাড়ীটা। দরজা ভেতর থেকে

বন্ধ ছিল। কলিং বেল টিপতেই খানিক পরে খুলে গেল দরজাটা। দেখি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মিস্ বিউটি।

"সমীর কোথায় ?" জিগ্যেস করলাম আমি।

"দাদা গেছে সিনেমায়, দিদি গেছে নেমন্তন্নে বন্ধুর বাড়ী, আর বাবা এখনও ফেরেন নি কোর্ট থেকে।" এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা বলে হাঁফাতে লাগল মেয়েটা।

"সুতরাং বাড়ীতে তুমি এখন একলা ?"

"সে কথা ব্যাখ্যা করে বোঝানোর দরকার আছে কি ?"

"না সেটুকু মগজ আমার আছে। আচ্ছা তাহলে প্রস্থান করি এখন।"

"আমার সঙ্গে কথা বলতে বুঝি আপনার ভাল লাগে না। দাদা আর দিদি না থাকলে আপনার গপ্প জমে না বুঝি ?"

"না, না, আমি ভাবছিলাম তোমাকে মিছিমিছি বিরক্ত করব না এখন।"—ব্যাপারটা সামলে নেবার চেষ্টা করি আমি।

"এতটা ভদ্রতা কোথায় শিখলেন আপনি ?" চোখ পাকিয়ে প্রশ্ন করলে মিস. বিউটি, "আসুন আপনি ভেতরে।"

হাত ধরে টেনে ভেতরে নিয়ে গিয়ে একরকম ঠেলে বসিয়ে দিল আমায় একটা কৌচে।

"চুপ চাপ বসে থাকুন এখানে লক্ষ্মী ছেলের মতন। গরম হচ্ছে বুঝি—না ?"—ফ্যানটা খুলে রেগুলেটরের কাঁটাটা টেনে নিয়ে গেল সে একেবারে শেষ সীমানায়। গোঁ গোঁ করে গর্জন করতে লাগল পাখার ইঞ্জিন। ঘরে বইতে লাগল হাওয়ার ঝড়।

লক্ষ্য করলাম মিস্ বিউটির চুল বব্ করা। জিজ্ঞেস করলাম—"কি ব্যাপার ? চুলটুল কেটে ফেলেছ যে মাথার ?"

"আপনার জ্বালায় আর কি! বিনুনীটা ধরে টেনে সেদিন মাথাটা একেবারে টনটনিয়ে দিয়েছিলেন আপনি। এখন কেমন জব্দ—আর কাবু করতে পারবেন আমায় ?"

"অকপটে হার মানছি আমি।"

"এতক্ষণ ভুলেই গিছলাম যে আপনি আমার অতিথি," সোফা থেকে হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে মেয়েটা, "বলুন কি এনে দেব আপনাকে—টফি না চকোলেট, না আইসক্রীম?"

"যা তোমার খুশী।"

"আচ্ছা দাঁড়ান এক মিনিট—পালাবেন না যেন"—এক রকম ছুটতে ছুটতেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মিস্ বিউটি। কয়েক মুহূর্ত পরে সে ঘরে ঢুকল একখানা প্লেট হাতে করে। প্লেটে সদ্য রেফ্রিজারেটর নির্গত একখণ্ড লোভনীয় আইস্ক্রীম।

"কেমন পছন্দ হয়েছে তো?"

"বিলক্ষণ," আইস্ক্রীমের সদ্ব্যবহারে তৎক্ষণাৎ প্রবৃত্ত হলাম আমি।

"এবার আমার পুরস্কার?"—সূক্ষ্ম ছুটো ভ্রূ তুলে আমাকে শুধালো মিস্ বিউটি।

"বলো, কি চাও তুমি?"

"যা চাইব, তাই দেবেন?"—মিস্ বিউটির মুখে পরিহাসের ধারালো হাসি।

"নিশ্চয়ই"—জুৎসই আর কোন জবাব বেরুল না আমর মুখ দিয়ে। মহা মুস্কিলে পড়া গেল দেখিছি এই পাগল মেয়েটার পাল্লায় পড়ে।

"আপনার আঙটিটা আমার ভারি পছন্দ।"

"এ আঙটি সোনার তো নয় রোলগোল্ডের। এর চেয়ে আর একটা ভাল দেখে সোনার আঙটি কিনে দেব আমি তোমায়।"

"না, এই আঙটিটাই আমার ভারি পছন্দ।"

"তাহলে নাও এটা," আঙটিটা আঙ্গুল থেকে খুলে আমি বলি।

"উঁহু, আপনিই পরিয়ে দিন এটা আমার আঙ্গুলে।"

আসঙ্কোচে আমার কোলের উপর রাখল সে তার হাত। অনেক

ধস্তাধস্তি করেও আঙটিটা ঢুকল না তার স্থূল অনামিকায়, অগত্যা কড়ে আঙ্গুলেই পড়িয়ে দিতে হোল সেটা।

ইলেকট্রিক বেলের শব্দ হোল বাইবে। কয়েক মুহূর্ত পরে ঘরে এসে ঢুকল সমীর।

"যাক, আপনার বন্ধু এতক্ষণে এসেছেন—এবাব আমার ছুটি।"

"কোথায় যাচ্ছ তুমি ?"

"রেডিও শুনতে—অনুরোধের আসর !"

এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল মিস্ বিউটি, এখনই কেন হঠাৎ রেডিও শোনবার তাড়া হোল তার।

ঠিক বুঝতে পারলাম না।

এরপর অনেকদিন যাইনি সমীরের বাড়ী। বিশেষ ব্যস্ত ছিলাম আমি পরীক্ষার পড়ায়।

সেদিন রাত্রে দরজাটা ভেজিয়ে একমনে পড়ছিলাম একটা পাঠ্য বই। হঠাৎ হট করে খুলে গেল দরজাটা। তাকিয়ে দেখি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আর কেউ না—মিস্ বিউটি।

"কি ব্যাপার—তুমি যে এখানে ?" সবিস্ময়ে প্রশ্ন করি আমি।

যখন আপনি একেবারে বন্ধ করে দিয়েছেন আমাদের ওখানে যাওয়া, তখন আমাকেই আসতে হোল আপনাব কাছে।"

"আমার বাড়ী চিনলে কি করে ?

"ঠিকানা সঙ্গে থাকলে বাড়ী চেনা আর কি এমন মুস্কিল ?"

"সমীর বুঝি দিয়েছে তোমায় আমার ঠিকানা ?"

"হুঁ দাদা আবার আমায় দেবে আপনার ঠিকানা। সেই ছেলে কিনা দাদা ? এক নম্বরের দুষ্টু সে—ঠিক আপনারই মতন। আমিও ছাড়বার মেয়ে নই। দাদার একটা বুকর‍্যাকে খুজে পোলাম

আপানার একটা বই তাতে লেখা ছিল আপনার ঠিকানা। আপনার পরীক্ষা কবে ?"

"আর দিন সাতেক বাকী আছে।"

"এবার কিন্তু আপনাকে আই.এ.এস. হতেই হবে।"

"হওয়া কি আমার হাতের মধ্যে ?"

"না হলে আমি ভয়ানক রাগ করব বলে দিচ্ছি। আমার রাগকে আপনি ভয় করেন না ?"

"বিলক্ষণ।"

"হ্যাঁ এই কথা যেন মনে থাকে আপনার—Good night"

"চললে নাকি ?"

"হ্যাঁ এই রাত অনেক হয়েছে। কাড়ীতে কাউকে বলে আসিনি আমি।"

যেমন ঝড়ের মতো এসেছিল, তেমন ঝড়ের মতো চলে গেল মিস্ বিউটি। সত্যি ভারি অদ্ভুত লাগে আমার এই মেয়েটাকে। যত দেখছি ওকে ততই আশ্চর্য্য হয়ে যাই আমি।

যথা সময়ে পরীক্ষা হয়ে গেল আর মাসখানেক পরে খবরও বেরিয়ে গেল যথা নিয়মে। নিজের চেখেকে আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকায় দেখি রয়েছে আমার নাম !

শুভ সংবাদটা নিয়ে তখুনি ছুটলাম আমি বোস সাহেবের বাড়ী। বোস সাহেব বাড়ীতেই ছিলেন। সকলে মিলে গল্প করছিলেন ড্রইং রুমে বসে।

খবরটা শুনে আমার হাত ধরে ঝাঁকুনিতে প্রায় নাড়ি ছিঁড়ে দিলেন তিনি। তারপর ইঙ্গ-বঙ্গ ভাষায় যা বললেন তার মর্মার্থ দাঁড়ায় এই—

"I congratulate you, young man। ভারি খুশী হয়েছি আমি। মনে পড়ে একদিন বলেছিলাম তোমায়—"Where there is a will, there is a way"—কেমন আমার কথা ঠিক হোল কিনা ?"

একটু থেমে বোস সায়েব বলে চললেন—"শোন, আজকের দিনে তোমায় একটা নুতন কিছু আমি Present করতে চাই। আমার মেয়ে আইরিনকে আমি আজ তোমার হাতে দিতে চাই। আশা-করি তোমার অমত হবে না।"

বুঝলাম মেয়ে গছাবার একটা মস্ত চাল চেলেছেন ধুরন্ধর ব্যারিষ্টার সাহেব। তবে আমারও আপত্তি করার বিশেষ কিছু ছিল না—নত মস্তকে চুপ করে রইলাম আমি।

"মৌনম্ সম্মতি লক্ষণম্," পাইপে অগ্নি সংযোগ করে বোস সাহেব বললেন "সম্মতিই হোল আসল জিনিস। বাকি যা কিছু রইল, সে তো একদিনেই শেষ করে ফেলা যাবে একটা শুভদিন দেখে।"

"বাহবা কি মজা," হাত তালি দিয়ে উঠল মিস্ বিউটি, "দিদির বিয়ে—আজ তাহলে সক্‌কলের জন্যে এক একটা টফি।"

"যা পাগলী" সস্নেহে বোস সাহেব বললেন, "নিয়ে আয় তোর টফি।"

দুম্ দুম্ করে ওপরে চলে গেল মিস্ বিউটি। কিন্তু ফিরে আর সে এল না। খানিক পরে চাকর নিয়ে এল টফির জারটা।

"দিদিমণি বললেন এখন তিনি আসতে পারবেন না। রেডিওতে একটা ভাল প্রোগ্রাম আছে—সেটা শুনে আসবেন তিনি "—নিবেদন করল চাকর।

"আচ্ছা যাও," বিরস বদনে বোস সাহেব চাকরকে বিদায় করেন। স্পষ্টই বোঝা গেল তিনি মোটেই খুশী হন নি খামখেয়ালী আবদারী মেয়েটার এই আদুরেপনায়।

ঘণ্টা খানেক পরে বোস সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম আমি। ব্যালকনির সিঁড়ি দিয়ে পথে নামতে যাচ্ছি, এমন সময়ে কোটের পেছনে পড়ল একটা টান। পিছন ফিরে দেখি, সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে আছে মোটা মেয়েটা।

"কি ব্যাপার মিস্ বিউটি?" একটু রাগত স্বরেই আমি বলি,—

"যাবার সময় আবার পিছু ডাকা কেন ?"

আঙ্গুল থেকে আঙটিটা খুলে আমার হাতের উপর ছুঁড়ে দিলে মিস্ বিউটি।

"এই আঙটি আমি চাইনা—এটা আপনার কাছেই থাক"—বলতে বলতে তার মৃদু স্বর বাষ্পরুদ্ধ হয়ে গেল। স্থূল গাল দুটোর উপর দর দর করে গড়িয়ে পড়ল চোখের জলধারা।

বিদ্যুতের ঝলকের মতো হঠাৎ আমার কাছে উন্মুক্ত হয়ে গেল মেয়েটির অন্তর। যাকে এতদিন পরিহাসের সামগ্রী ভেবে এসেছি, তার ভেতরেও থাকতে পারে তাহলে একটা মন আর সে মনের ভেতরে গুমরে থাকতে পারে এতখানি অভিমান !

ফিরে চলে যাচ্ছিল সেখান থেকে মিস্ বিউটি। হঠাৎ কি আমার মনে হোল, খপ্ করে ধরলাম আমি তার হাত। তারপর তাকে কাছে টেনে এনে বললাম—"তোমায় যে আঙটি একবার দিয়েছি, আমি তা আর ফিরিয়ে নিতে পারি না। আমারি ভুল হয়েছিল, তোমায় আমি ঠিক চিনতে পারি নি"—এই বলে তার কম্পিত আঙ্গুলে আবার পরিয়ে দিলাম সেই আঙটিটা।

আমার বন্ধুদের মধ্যে যে শোনে, সেই আশ্চর্য হয়ে যায়, কি করে আইরিনকে ছেড়ে মিস্ বিউটিকে বিয়ে করে বসলাম আমি।

ঝিম্ ঝিম্ বরষায়

বোনের বিয়ে দিতে দিতে জীবনটা ফতুর হয়ে গেল। বাবা মারা যাবার পর সংসারটা ভেঙ্গে পড়ল আমার ঘাড়ে। এই ভাঙ্গা সংসারের ঘানি টানবে কে—আমি ছাড়া!

মেসের বাড়ীর দোতলায় থাকি আমি আর সুজন। সুজন বেকার, দিনের বেলার টো টো করে ঘুরে বেড়ায় পথে ঘাটে আর আমি কলম পিষি আপিসে। রাত্তিরে বাঁয়া-তবলা নিয়ে সুজনের একঘেয়ে সঙ্গীত চর্চা চলে রোজ। এইটাই তার জীবনের একমাত্র সখ বোধ হয়। আমি তখন পালিয়ে বেড়াই পাড়ায় টিউশানি করতে। উপরি আয় তো চাই।

হুম্ করে একদিন সুজন উধাও হয়ে গেল আর সেই সঙ্গে শুনলাম পালিয়েছে পাশের বাড়ির মেয়ে সুলতা। সুজন অতি সুশ্রী, তার উপর কম বয়স—যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ। কিন্তু কোন সাহসে এই বয়সে বিয়ে করে ছোকরা বাপকে কলা দেখিয়েছে? সে কায়স্থ—বামুনের মেয়েকে নিয়ে উড়ে যাওয়া কি এত সস্তা এই বাজারে?

দিন তিনেক পরে সুজন এসে বৌভাতের নেমন্তন্ন করে গেল। বিয়েটা হয়েছে তাদের কালিঘাটে—বৌভাতের ফিস্টিটায় আমায় যেতে হবে। অর্থাৎ কিছু টাকা খসাতে হবে পকেট থেকে উপহারের দক্ষিণায়।

বিয়ে বাড়িতে সুজন পরম আপ্যায়িত করলে আমায়—যেন আমি তার অভিভাবক। তাকে ঘিরে চ্যাংড়া ছোঁড়ার দল সস্তা র‍্যাক-চেয়ারে বসে আসর জমিয়ে রেখেছে। ঘরেতে একটা ট্রানজিষ্টারে বাজছিল ফিল্মী গানের সুর।

একটা চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিল সুজন আমার দিকে। গলাটা

ভিজিয়ে বললাম—"কংগ্রাচুলেশান সুজন। সংসারের বাজীতে তুমিই জিতে গেলে।"

সুজন মৃদু হেসে জবাব দিলে –"আমি এখন রেডিওতে গান দিচ্ছি অনাদিদা—কয়েকটা রেকর্ডও হয়ে গেছে। এঁদের যে দেখছেন এই ঘরে—এঁরা সবাই আর্টিস্ট। কেউ সেতারী, কেউ গায়ক আর কেউবা তবলচি। এঁরা আমার বন্ধু—আসুন পরিচয় করিয়ে দি।

তা হবে। সুজন তাহলে রেডিও আর্টিস্ট হয়েছে। কিন্তু কতটা বা পায় সে গলা সেধে? আমি তো কলম পিষে বুড়িয়ে গেলাম—তবুও সংসার ভাল ভাবে চলে না।

পরিচয়ের পালা সাঙ্গ হলে সুজন বললে—"আসুন অনাদিদা, বউ দেখতে।" আমায় নিয়ে গেল সুজন সেই ঘরে অতি শ্রদ্ধা আর বিনয়ের সঙ্গে—যেন আমি মহামাননীয় অতিথি!

প্রস্ফুটিত পদ্মের মতো সুজনের বৌ সুলতা বসে আছে একটা ফুল দিয়ে সাজান চেয়ারে। মেয়েটির রঙ শ্যামলা—কিন্তু ভারি স্নিগ্ধ তার চোখের ভীরু চাউনিটি। মিষ্টি মুখটায় ফোঁটা ফোঁটা ঘাম লেগে আছে—যদিও ওপরে পাখাটা ঘুরছে বন্ বন্ করে।

উপহারের বইটা তার হাতে তুলে দিলাম পরম বিজ্ঞ অভিভাবকের গম্ভীরতায়।

মেয়েটি একটুখানি মিষ্টি হেসে টুক করে আমার একটা নমস্কার করলো।

সুজন বললে—"চলুন অনাদিদা, খেয়ে আসা যাক।"

সুজনের সঙ্গে দেখা হয় মাঝে মাঝে। খালি বিরক্ত করে আমার তাদের বাড়ী যাবার জন্যে। আমার সময় কোথায়? সারাদিন হাড়ভাঙ্গা আপিসের খাটুনি আর রাত্তিরে টিউশানি। এর পরেও কি যাওয়া যায় কোথাকার কোন মতিলাল কলোনীতে?

সেদিন আপিসে বসে কাজ করছি ধুঁকতে ধুঁকতে। দিন

তিনেক আগে ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল—ম্যাজম্যাজে ভাবটা কেটেও কাটছে না।

সুজন এসে ধপ্ করে বসে পড়ল সামনের চোয়াটায়। একটু বেঁকে হেসে সে বললে—"বাড়িতে একটু পায়ের ধুলো দেবেন অনাদিদা কাল আমাদের বিয়ের বার্ষিকী।"

মনটা খিঁচড়ে ছিল। যাচ্ছেতাই গাল দিতে ইচ্ছে করল। কেন যে ছোকরা আসে আমার কাছে বার বার!

অসুখের কথা বেমালুম চেপে বললাম—"আমার অন্য কাজ আছে।"

সুজন চলে গেল খানিকটা মনমরা হয়ে। এবার বগটা টিপে ফাইলটা আঁকড়ে নিলাম। ফাইলের লেখাগুলো চোখের সামনে নাচতে লাগল কিছুক্ষণ—অসুখটা বোধ হয় সারেনি পুরো।

পাঁচটা বাজার একটু আগে সুরু হোল ঝুপ্ ঝুপ্ বৃষ্টি। কি আপদ! এখন তিথ্যি কাকের মতো ভিজতে ভিজতে ফিরতে হবে বাড়ী।

শ্রাবণের আকাশটা ঘোলাটে। ফাঁকা রাস্তায় আলোর সারি জ্বলছে মিট মিট করে—আর অঝোর ধারায় ঝরছে বৃষ্টি।

খানিকটা দেখে বুঝলাম যে, আজ রাত্তিরে বৃষ্টি থামবে না। আপিস থেকে বেরিয়ে পড়লাম অগত্যা। মাথাটা টিপ্ টিপ্ করছে তখন—এক কাপ চা খেলে ভাল হতো। প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে দাঁড়ালাম বাস স্ট্যাণ্ডে। পাঞ্জাবীটা একেবারে ভিজে সপ্‌সপে হয়ে গেছে। এ পাড়ার স্ট্যাণ্ডটা রাস্তার আলো থেকে অনেক দূরে—ভেতরটা একেবারে অন্ধকার।

গুম্ গুম্ করে মাথার উপরে মেঘের কানাড়া বেজে উঠল আর সাঁ সাঁ করে বাদলা হাওয়ায় নুইয়ে পড়ল দূরে পার্কের গাছগুলো। স্ট্যাণ্ডের এক কোণে দেখি একটি ভদ্রমহিলা বোধ হয় ভিজে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। অন্ধকারে তাঁর মুখটা ভাল দেখা যাচ্ছিল না।

পাঞ্জাবীর পকেটটা হাৎড়ে একটি সিগ্রেট বার করলাম। বার-কয়েক দেশলাইয়ে কাঠিটা ঠুকে দেখলাম যে বারুদটা জল লেগে ট্যাপ্ সা।

গাড়িগুলো সব সাঁ সাঁ করে চলে যাচ্ছিল আর আমার বাসটা যেন ধর্মঘট করে বসে আছে। অনেকক্ষণ পরে দূরে একটা বাস আসছে দেখতে পেলাম।

প্যাঁক! প্যাঁক! মোটরের হর্ণের বিদঘুটে আওয়াজে পাশ ফিরে তাকালাম। আমার পাশের মহিলাও দেখলাম সেইদিকে তাকিয়েছেন। আচমকা মোটরের হেডলাইটের আলোটা ঠিকরে পড়ল মহিলার মুখের উপর ক্ষণিকের জন্যে। চমকে দেখি যে সে ভদ্রমহিলা সুলতা।

আমি চুপ করে রইলাম। সুলতা বোধহয় একটু মিটি মিটি হাসলে। আমি সুলতাকে যে সারাজীবন ভালবেসেছি—তাকে মুখ ফুটে বলতে পারলাম কৈ? বাসটায় উঠে পড়ল সুলতা। বাস ছেড়ে দিল। আমি পড়ে রইলাম পেছনে।

অবচেতন মন

"এই ভাবে ধরতে গেলে আমরা সকলেই সারাজীবন অভিনয় করে আসছি। সব সময়ই এক মুখোশ পরে রয়েছি আমরা। যা বলবার তা আমরা বলি না, যা করবার তা আমরা করি না, আর যা নই, তা আমরা হই। কিন্তু কখনও কখনও এই মুখোশ খুলে যায়। তখন বাঁধন ছেঁড়া বল্গাহীন পাগলা ঘোড়ার মতো অবচেতন মন বা Unconscious mind এমন কাজ নেই, যা করতে পারে না। ভাবলে শুধু আশ্চর্য হতে হয়, কি করে বেঁধে রাখি আমরা এই দুর্ধর্ষ, দুর্দাম, দুষ্ট ঘোড়াকে।"

এক মুখ ধোঁওয়া ছেড়ে শ্রীযুক্ত দার্শনিক আমায় এই কথা বললেন॥ কয়েক মিনিট আগে ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে এই রেস্তোঁরায়। ভদ্রলোকের বয়স প্রায় পঞ্চাশ হবে। দীর্ঘ কাঁচা-পাকা চুল অযত্নে ব্যাকব্রাশ করা। চিবুকের নীচে ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি। চোখে পুরু লেন্সের চশমা।

কফির পেয়ালাটায় চুমুক দিয়ে আমি বললাম—"একবার শুধু কয়েকটা মুহূর্তের জন্য ছাড়ান পেয়েছিল আমার এই অবচেতন মন। সে কয়েকটা মুহূর্তে আমি যা করেছি, সারাজীবন আমি তা করতে পারতাম না। পরে আমি অনেকবারই ভেবেছি আর এখনও ভাবি—এই-ই তো সেই আমি, কিন্তু কি যেন হয়ে গিয়েছিলাম আমি তখন। যেন আমার মধ্যে আমিই ছিলাম না সে সময়ে, যেন খুদে শয়তান আমার কাঁধে ভর করেছিল সেই কিছুক্ষণের জন্য। এখনও তো বেশ জোরেই বৃষ্টি পড়ছে দেখছি বাইরে। দশ মিনিটের মধ্যে বৃষ্টি থামবে বলে তো মনে হয় না। তবে শুনুন আমার সে কাহিনী—দশ মিনিটের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে এটা।

অনেকদিন আগেকার কথা। তখন ভারত সবে স্বাধীন হয়েছে। অক্টোবর মাসে আমি প্লেনে রওনা হয়েছিলাম লণ্ডনে—একটা বিশেষ ব্যবসা-সংক্রান্ত কাজে। প্লেনটা প্যান ওয়ার্লড সার্ভিসের। ভারি আরামপ্রদ প্লেনটির কামরা। স্নিগ্ধ নীলাভ ফ্লাড্ লাইটে আলোকিত সেই এয়ার কণ্ডিশনড্ কক্ষের প্রত্যেকটি সীটই আধহাত পুরু গদী দিয়ে মোড়া। যাত্রিদের মধ্যে বেশির ভাগই বিদেশী—চার-পাঁচ জন চীনা, দু-তিন জন জাভাদেশীয়, আর সাত-আট জন ইউরোপীয়ান। ভারতীয়দের মধ্যে আমারা ছিলাম মাত্র তিন জন। একজন, এক স্থূলকায় মারোয়াড়ী—সব সময়ই নিদ্রাসুখে মগ্ন ছিলেন তিনি। দ্বিতীয়টি এক দীর্ঘ রোগা গুজরাটি—একটা খবরের কাগজ নিয়ে বসে ছিলেন তিনি সামনের সীটে—আর তৃতীয় আমি। আমাদের এয়ার হোস্টেস ছিল এক ভারতীয় মহিলা। গৌরবর্ণা দীর্ঘচ্ছন্দা দেহ—বেশ সুন্দরীই বলা চলে তাকে। নাম তার মোহিনী কাপুর। জাতে পাঞ্জাবী। আজ তিন বছর ধরে এই কাজ সে করে আসছে। আমাদের মৌখিক আলাপ শীঘ্রই ঘনিষ্ঠতায় পর্যবসিত হলো একটা বিশেষ ঘটনায়, যা দিয়ে এক ডিটেকটিভ্ গল্প লেখা চলে অনায়াসে। সে কথাই আগে বলি।

দ্বিপ্রাহরিক ভোজের সময়ে মোহিনী Serve করছিল আমাদের ভোজ্য। হাতের আঙটিটা খুলে একটা টেবিলে রেখে সে পরিবেশন করছিল খাদ্য-সামগ্রী। কাজ সারা হলে ফিরে এসে সে দেখে, যে সেখান থেকে তার অঙ্গুরীয়টি অদৃশ্য—সকলের চোখের সামনে আর তার নিজের নজরের উপর।

আমি মোহিনীর কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম তখন। আমাকে সামনে দেখতে পেয়ে সে আমায় আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল, তারপর বিবৃত করলে সে সব ঘটনা সবিস্তারে।

"যেমন করে হোক আঙটিটা খুঁজে দিন মিষ্টার," আকুল কণ্ঠে মোহিনী আমায় বললে, "আমার কাছে এ আঙটির দাম দুর্মূল্য সোনার হিসাবে নয়, অমূল্য স্মৃতির অনুপাতে। এ আঙটিটি আমার জন্মদিনে মার দেওয়া এক উপহার—আমার মা আজ আর পৃথিবীতে নেই।"

নিজের সীটে ফিরে এসে বসে বসে ভাবতে লাগলাম এই আশ্চর্য চুরির কথা। প্লেনে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সকলেই সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। একটা সামান্য আঙটির লোভে তাঁরা কেউ চুরি করতে যাবেন না ঠিকই। আর সে চুরির কি লাভ যখন প্লেনের কামরায় চোরাই মাল লুকিয়ে রাখা প্রায় অসম্ভব আর সার্চে ধরা পড়লে প্রাণান্তকর বেইজ্জতি। হয় তো ভুল করে কেউ নিয়েছেন আঙটিটা, কিন্তু তাহলে এখনও তিনি ফেরত দিচ্ছেন না কেন? হয় তো এখনও এই ভুল নজরে পড়েনি তাঁর—কিন্তু তাই বা কেন?

চোখে চশমা লাগিয়ে আমি নিবিষ্ট মনে দেখতে লাগলাম আমাদের যাত্রীদের। আমার পাশে বসেছিলেন সেই মারোয়াড়ী ভদ্রলোক। গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন তিনি। প্লেনের আওয়াজ ছাপিয়ে উঠছিল তাঁর নাসিকার গুরুগম্ভীর মন্দ্র। দশ আঙ্গুলে তাঁর আটটি সোনার আঙটি—প্রত্যেকটায় দামী হীরা বসানো। আমার পেছনে দুজন চীনা ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে তর্ক করছিলেন একটা বিষয় নিয়ে। তাঁদের প্রত্যেকটা কথাই আমার কানে আসছিল, যদিও তার একটা বর্ণও ঢুকছিল না মগজে। আমার ঠিক সামনে বসেছিলেন দাড়িওয়ালা এক বুড়ো ইংরেজ—নিবিষ্ট মনে পড়ছিলেন তিনি একটা বই। উঁকি মেরে দেখি, সেটা হচ্ছে Cale এর differential calculus. হাঁ, ভদ্রলোক প্রফেসারই বটে। নইলে এমন আরামের জায়গায় বসে অমন বেয়াড়া বই কেউ পড়তে পারে একটা চিত্তাকর্ষক নভেলের মতো? ভদ্রলোকের হাতটা হাঁটুর ওপরে রাখা। অনামিকায় রয়েছে একটা সোনার আঙটি। আঙটিটা উলটো করে পরা—আঙটির প্লেটটা

হাতের উল্টো দিকে অর্থাৎ চেটোর দিকে ফেরানো। হ্যাঁ, ভদ্রলোক অন্যমনস্ক বটে—যেমন সব প্রফেসারই হয়ে থাকেন আর কি!

মোহিনীকে আমি ডাকলাম। গুজরাটি ভদ্রলোকের সঙ্গে রসালাপে ব্যাপৃত ছিল সে। ডাকতেই সোজা চলে এলো আমার কাছে। আমার দিকে একটা ঈর্ষা-কুটিল সকোপ দৃষ্টি হেনে গুজরাটি ভদ্রলোক মনোনিবেশ করলেন তাঁর খবরের কাগজে। কাছে এসে মৃদুকণ্ঠে মোহিনী আমায় জিগ্যেস করলে—"কি, কিছু সন্ধান পেলেন আমার আঙটির?"

"পেয়েছি বলেই তো আমার বিশ্বাস। সামনের সীটে যে ভদ্রলোককে দেখছেন না বই পড়তে—"

"হ্যাঁ।"

"উনি একজন আপন ভোলা প্রফেসার। অন্যমনস্কে তোমার আঙটিটা পড়ে বসে আছেন। উল্টো করে আঙটিটা পরেছেন বলে এখনও তাঁর নজরেই পড়েনি নিজের ভুলটা।"

"আচ্ছা দেখছি আমি।"—এই বলে মোহিনী গিয়ে দাঁড়াল ঠিক প্রফেসারের পাশে।

"Excuse me Professor—"

"আমায় কি করে চিনলে তুমি প্রফেসার বলে?" বই থেকে মুখ তুলে নিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন তিনি।

"গুণী লোককে কি আর চিনতে দেরী লাগে?"

"হুঁ, প্রায় ঠিকই ধরে ফেলেছ তুমি। আমি অক্স্‌ফোর্ড ইউনিভারসিটিতে ম্যাথামেটিক্‌স্‌ পড়াই। তবে প্রফেসার আমি নই। আমি রীডার। হুঁ, কিছু বলছিলে তুমি আমায়?"

"আপনার আঙটিটা একবার দেখতে পারি? আমার ভারি পছন্দ ওটা।"

"নিশ্চয়ই"।

আঙ্গুল থেকে আঙটিটা খুলতে গিয়ে প্রফেসার বললেন—"একি,

এ তো আমার আঙটি নয়। কোথায় গেল আমার আঙটিটা? এত ভুল আমার হয়!"

কোটের পকেট হাতড়ে কয়েক মুহূর্ত পরে বেরুল তাঁর নিজের খোওয়া আঙটি।

"আমার আঙটি তো পাওয়া গেল," প্রফেসার সাহেব উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, কিন্তু এখন মুস্কিল হলো এ আঙটি নিয়ে। কার আঙটি ভুল করে পরে বসলাম বলো তো? এত ভুল আমাব হয়!"

"ওটা আমারি আঙটি," মৃদু হেসে মোহিনী বললে।

"ওঃ", স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে প্রফেসার প্রত্যর্পণ করেন সেই আঙটিটা। তার পরেই বইটা তুলে নিয়ে মনোনিবেশ করলেন তাতে।

আমার কাছে মোহিনী এলে আমি বললাম তাকে—"তোমার আঙটি তো তুমি পেলে—এবার আমার ইনামটা?"

"দাঁড়ান এক মিনিট—" মাথার বব্ করা চুল দুলিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মোহিনী। খানিক পরে ফিরে এলো সে, এক হাতে কিস্‌মিসের চুমকি বসানো একখণ্ড কেক আর অপর হাতে এক পেয়ালা ধূমায়িত কফি নিয়ে। কেক আর কফি টেবিলে রেখে বসল সে আমার পাশে।

"প্লেনে আপনার কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?" জিগ্যেস করল সে আমায়।

"না তুমি থাকতে আর অসুবিধা কি হতে পারে? তবে মনটা বড় ভাল নেই—Tantalus এর মতো অবস্থা আমার।

"কি বললেন?"—সূক্ষ্ম ভুরু দুটো তুলে মোহিনী আমায় প্রশ্ন করলে।

"না—এই বলছিলাম বেচারা Tantalus-এর কথা। তৃষ্ণায় বুক শুকিয়ে যাচ্ছে, সামনে শীতল জলের ধারা, অথচ তৃষ্ণা মেটাবার উপায় নেই। ক্ষিধেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে, সামনে গুচ্ছ গুচ্ছ আঙ্গুর,

থলো থলো বেদানা, আপেল আর নাশ্‌পাতি—অথচ একটা ফলও মুখে দেবার উপায় নেই। এক পকেটে সিগারেট কেস্‌ ভর্ত্তি গোল্ড-ফ্লেক, আর এক পকেটে সিগারেট লাইটার, অথচ একটাও সিগারেট তোমরা খেতে দেবে না প্লেনেতে।"

মোহিনী হেসে ফেলল। এত সুন্দর ওকে মানায় হাসলে। গালেতে চমৎকার একটা টোল পড়ে।

"ক্রয়ডন পর্যন্ত কোন রকমে ধৈর্য ধরে থাকুন; তারপর যত খুশী সিগ্রেট খান, কেউ কিছু বলবে না।

"ধৈর্য যে আর থাকে না। ক্রয়ডন আসতে এখনও সাড়ে চার ঘণ্টা।"

"কিন্তু ততক্ষণে আপনার কফিটা যে জুড়িয়ে যাবে একেবারে।"

"সেটা ঠিক কথা, যার যা সময় সে তা নেবেই। জীবনের সব কিছুতেই কাজ করে চলে আইনষ্টাইনের "Fourth Dimention, অলক্ষ্যে আর সঙ্গোপনে।"

কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে আমি বলি, "এই প্লেনেতে তোমায় দেখে আমার ভারি আশ্চর্য লাগছে। ফরেণ এয়ার সার্ভিসে ভারতীয় এয়ার হোস্টেস সচরাচর দেখাই যায় না।"

"আমার এখানে চাকরি পাবার মধ্যে একটু ইতিহাস আছে। শুনুন বলি—

মেয়েটি খুবই সরল। আমার কাছে অকপটেই বলে গেল তার জীবনের অতি গোপনীয় কাহিনী। এতলোক থাকতে হঠাৎ আমাকেই বা তার শোনাবার ইচ্ছা হোল কেন—এ প্রশ্ন Psychiatrist-দের (মনস্তত্ত্ববিদদের) বিবেচ্য, অবচেতন মন সম্বন্ধে যাঁদের জ্ঞান আমার চেয়ে ঢের বেশী। আমি শুধু সংক্ষেপে বিবৃত করছি, তার মুখে শোনা এই কাহিনী।

মোহিনী আসলে পাঞ্জাবের এক রেফিউজী নারী। লাহোরের

দাঙ্গায় তার বাপ, মা এবং পরিবারের সকলেই মারা পড়ে। একরকম নিঃসহায় আর নিঃসম্বল অবস্থাতে সে কোন রকমে পালিয়ে আসে দিল্লীতে। দিল্লীতে পৌঁছে সঙ্গে যা কিছু ছিল, তাই দিয়ে সে কিনে ফেলল একটা কলকাতার টিকিট। শুনেছিল সে কলকাতা শহরে নাকি টাকা ছড়ান আছে—শুধু কুড়িয়ে নেবার অপেক্ষায়। কিন্তু কলকাতায় এসে সে দেখল, সে যা শুনেছিল আসলে তা মোটেই সত্য নয়। কয়েকদিন অনাহারে পথে পথে ঘুরে বেড়াবার পর এক আমেরিকান ভদ্রলোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হোল তার দিকে।

তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। কলকাতার উঁচু উঁচু অট্টালিকার ফাঁকে ফাঁকে খাঁজকাটা সীমাবদ্ধ আকাশে অন্ধকার নেমে আসছিল তার কালো ডানা মেলে। আমেরিকান ভদ্রলোকটি পার্ক স্ট্রীটের রেস্তোঁরা থেকে বেরিয়ে সবে মাত্র পথে পা দিয়েছেন, এমন সময় .মাহিনী তাঁকে সেলাম করে চাইল একটা পয়সা।

"এক পয়সা চাও তুমি—মাত্র একটা পয়সা?" দুচোখ কপালে তুলে সুধোন শ্বেতাঙ্গ, "কি করবে একটা পয়সা নিয়ে?"

ভড়কে গেল মোহিনী সে অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে।

"আমার কাছে এক পয়সাই যথেষ্ট হুজুর—আজ সারাদিন খেতে পাইনি।"—আমতা আমতা করে সসঙ্কোচে বললে সে।

"শোন, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে—এসো." হাত ধরে তাকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন ভদ্রলোক একেবারে রেস্তোঁরার ভেতর। তারপর একটা গোল টেবিলের পাশে একটা চেয়ারে বসে তার দিকে ঠেলে দিলেন আর একটা চেয়াব।

মোহিনী উপবেশন করলে একটা সিগ্রেট ধরিয়ে তিনি বললেন—"পয়সা চাও তুমি? আমি তোমায় টাকা দিতে পারি। এক টাকা, দুটাকা মাত্র নয়—পুরো পনেরশ টাকা। শুধু একবার নয়—প্রতি মাসে। প্যান ওয়ার্লড্ সার্ভিসের এয়ার হোস্টেসের চাকরি এখুনি

তোমায় দিতে পারি আমি। তবে একটা সর্ত আছে। শুধু একরাত্রির জন্য তোমাকে বিক্রি করতে হবে আমার কাছে। ভেবে দেখ, একদিকে সারাজীবনের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম, অন্যদিকে দুঃসহ দারিদ্র্য আর অভাব—সে তুলনায় আমার দাম অতি নগন্য মাত্র।"

নিষ্পলক ভাবে মোহিনী চেয়ে রইল সামনের দিকে। কথা কইবার শক্তি তার লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সামনের দেয়াল ঘড়ির লম্বা পেণ্ডুলামটা অবিরত এদিকে থেকে ওদিকে দুলছিল টক্ টক্ করে। তার মনও দুলতে লাগল সংশয়ের দোলায় ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতোই।

আমেরিকান ভদ্রলোকটি তাঁর কথা রাখলেন। এয়ার হোস্টেসের চাকরি পেয়ে গেল মোহিনী, সেই সামান্য নগণ্য তাম্র মূল্য দিয়েই।

"সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম—সবকিছু আমি পেয়েছি জীবনে"—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মোহিনী বললে, "তবু মন আমার কিছুতে ভরে না। মনে হয়, সব কিছু পেয়েও আমি যেন কিছুই পাইনি। মনে হয়, সবচেয়ে সুখী হয়েও আমি যেন সবচেয়ে দুঃখী। শুধু পাবার সুখই পেয়ে এলাম—দেবার সুখ এ জীবনে আর পেলাম না।

চুপ করে রইলাম আমি। জবাব দেবার কিছু ছিল না। এই তো জগতের নিয়ম—এই তো সংসারের চিরন্তন Tragedy। মানুষ যা চায় তা সে পায় না, কিন্তু পায় যা সে তা চায় না।

"আমার ভাগ্য", মোহিনী বলে চলল, "এই প্লেনের সঙ্গে আছে জড়ানো। যতদিন এই প্লেন আকাশে উড়ছে, ততদিন আমি আছি এই পৃথিবীতে। তারপর যে দিন এ প্লেন ধ্বংস হবে অ্যাকসিডেণ্টে সেদিন আমার জীবনেরও হবে শেষ। আমি খুব ভাল করে জানি প্লেন অ্যাকসিডেণ্টেই হবে আমার মৃত্যু।"

"এরকম মন নিয়ে তোমার একাজে আসা উচিত হয় নি," আমি

বলি, "অত ভয় পেলে কি চলে? Accident is Accident। কেউ জানে না ঠিক ঠিকানা কোন বিপর্যয়ের, হয় তো আজই প্লেনে ঘটবে সেই দুর্বিপাক। এখনই হয় তো কলছেড়া ঘুড়ির মতো পাক খেতে খেতে ডানা মেলে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়বে মানুষের তৈরী এই বিরাট পতঙ্গটা। তারপর? এখন বেঁচে আছি, হাসছি, কথা বলছি—তখন কে কোথায় থাকব কে জানে?"

চেয়ার থেকে উঠে চলে গেল মোহিনী ঘর ছেড়ে। একটা ম্যাগাজিন নিয়ে তাতে মনঃ-সন্নিবেশ করার চেষ্টা করলাম আমি। কিন্তু ভাল লাগল না। জানলা দিয়ে তাকালাম বাইরে। একরাশ হীরার কুচির মতো জ্বল্ জ্বল্ করছিল রাতের তারাগুলো। আর আকাশের একটা দিক উজ্জ্বল করে সবে মাত্র উঠছিল পূর্ণিমার চাঁদ।

চোখ ফিরিয়ে নিলাম আমি প্লেনের ভেতর। সারা কক্ষে এক আলস্য-জড়িত তন্দ্রার ভাব। কেউ ম্যাগাজিন পড়েছেন, কেউ ঢুলছেন, আর কেউবা একেবারেই পড়েছেন ঘুমিয়ে। প্লেনের বিরামহীন আওয়াজের একটা নিদ্রাকর্ষক শক্তি আছে মানতেই হবে। ধীরে ধীরে ঘুমে জড়িয়ে এলো আমার চোখ. চোখের পাতা দুটো আস্তে আস্তে নেমে এলো স্নিগ্ধ নিদ্রার ভারে।

হঠাৎ এক ভীষণ ঝাঁকুনিতে ঘুম আমার ভেঙে গেল। প্লেনটা তখন এদিক থেকে ওদিকে দুলছিল। এঞ্জিনটা করছিল এক অদ্ভুত আর্তনাদ।

সামনের দরজাটা খুলে গেল। ঝড়ের বেগে ঘরে এসে ঢুকল এয়ার হোস্টেস্ মোহিনী। রক্তহীন ফ্যাকাশে তার মুখ—উদভ্রান্ত তার চোখের দৃষ্টি, উত্তেজনায় স্ফুরিত হচ্ছিল তার বিবর্ণ অধরটা। সামনের টেবিলের কোণটা হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে কম্পিত কণ্ঠে সে বললে,—"Ladies and Gentlemen, take the name of God। প্লেনের এঞ্জিন খারাপ হয়েছে—সারাবার কোন উপায় নেই। আর কয়েক মুহূর্ত পরে মাটিতে পড়ে

চুরমার হয়ে যাবে আমাদের প্লেনটা। আপনারা সকলে মৃত্যুর জন্ম প্রস্তুত হোন।

ঘুম ভেঙেই আচমকা এই অপ্রত্যাশিত খবরে মনটা আমার যেন কি রকম হয়ে গেল। আমি বুঝতে পারছিলাম না, কোথায় আছি আমি—বাস্তব জগতে, না স্বপ্ন রাজ্যে। মনে হচ্ছিল এও বুঝি তেমনি এক স্বপ্ন, যা একটু আগে দেখছিলাম আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে।

আমি আর থাকতে পারলাম না। সোজা ছুটে গেলাম মোহিনীর কাছে। তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলাম আমার বুকে। এক ঝটকায় তার ব্লাউজটা টেনে ছিঁড়ে দিলাম আমি আর চুমোয় চুমোয় ভরে দিলাম তার মুখ। তারপর বললাম হাঁফাতে হাঁফাতে—"মোহিনী, মোহিনী, মরবার আগে একবার শোন। আমার সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে আমি তোমায় চাই, চাই আমার দেহের প্রতিটি অণুপরমাণু দিয়ে—চাঁদকে যেমন চায় রাহু।'

আমার বুকে মুখ গুঁজে মৃদু অস্ফুট স্বরে মোহিনী বললে—

"প্রিয়, আমি তোমায় ভালবাসি। জীবনে এই প্রথম ভালবাসলাম। কিন্তু কতক্ষণই বা তোমায় কাছে পাব ?

এই হলো সেই অবগুণ্ঠন-মুক্ত মনের রূপ, যার কথা একটু আগে আপনার সঙ্গে আলোচনা করছিলাম (দার্শনিক বন্ধুকে বলি আমি)। সে সময়ে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে লোকে আমায় এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক বলে জানে ; আমার মনেই ছিল না যে সেই কামরায় আরও অনেক সব যাত্রী ছিলেন, যারা সকলেই সম্ভ্রান্ত লোক ; একবার ভেবেও দেখিনি তখন যে যাত্রীদের মধ্যে অনেক মহিলাও ছিলেন আর ছিলেন অনেক ভদ্রলোক, যাঁদের বয়স আমার দ্বিগুণেরও বেশী। বাঁধন-ছেঁড়া বন্দীর মতো মন আমার তখন উন্মত্ত

অপ্রত্যাশিত স্বাধীনতার উত্তেজনায়। চোখের সামনে শুধু দেখছিলাম অনাগত, আসন্ন, ভয়ঙ্কর মরণকে।

কয়েক মুহূর্ত পরে Cockpit-এর দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন সহকারী পাইলট (Co-pilot) সাহেব। চোখ থেকে মুখ জোড়া অদ্ভুত-দর্শণ চশমাটা নামিয়ে তিনি বললেন—'ভগবানকে ধন্যবাদ—আমরা এঞ্জিনটা ঠিক সময়ে মেরামত করতে পেরেছি। আর একটু দেরী হলেই প্লেনকে অ্যাকসিডেণ্ট থেকে বাঁচান যেত না।"

মোহিনী তখনও আমার আলিঙ্গন-বদ্ধ। আমার মুখের দিকে তখনও তাকিয়েছিল সে অর্থহীন বিস্ফারিত দৃষ্টিতে। যা ঘটল সেটা যেন তার অভিপ্রেত নয়—প্লেনটা যে অ্যাকসিডেণ্ট থেকে বাঁচে, এটা যেন সে মোটেই চায় না।

হঠাৎ ঝট্ করে সে নিজেকে মুক্ত করে নিল আমার আলিঙ্গন থেকে। তারপরেই সে ছুটে গেল প্লেনের বর্হির্গমন দরজাব দিকে। পর মুহূর্তে এক ঝটকায় দবজার পাল্লাটা খুলে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল মহাশূন্যে। আমিও ছুটে গেলাম তার পিছু পিছু সেই দবজা অবধি।

দেখলাম নির্মেঘ নীল আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ জ্বলছে। নীচে বহু দূরে লোকালয়েব বসতিগুলো অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছিল। ছোট ছোট বাড়িগুলো মনে হচ্ছিল যেন তাসের বাড়ি, যেন স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সেগুলো নীল আকাশের পটে কিউবিক্যাল পেইন্টিংগ-এ আঁকা এক একটা ছবি। আর দেখলাম আমার চোখেব সামনে দিয়ে দ্রুত বেগে নীচে নেমে যাচ্ছে মোহিনী। ক্রমশঃ ছোট থেকে আরও ছোট হয়ে এল তার দেহ, তারপর আর তাকে দেখা গেল না।

আমি চিত্রাপিতের মতো নিস্পন্দ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম দরজার পাল্লাটা ধরে। ভাবলাম এও অবচেতন মনের আর এক অদ্ভুত খেলা। কে জানত আজ এই ভাবেই শেষ হবে হতভাগিনী পতিতার শান্তিহীন সুখময় জীবন?

এরপরে বলার মতো বিশেষ কোন ঘটনা নেই। ঘণ্টা দেড়েকের

মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলাম ক্রয়ডনে। হোটেলে শুয়ে সে রাত্রে আর ঘুম এলো না চোখে। পরের দিন খবরের কাগজে পাঠ করলাম এই দুর্ঘটনার বিবরণ, যার চাক্ষুষ সাক্ষী ছিলাম আমি নিজে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আমার দার্শনিক বন্ধু বললেন—

"একে একরকম ভাগ্যদেবতার পরিহাস বলা যেতে পারে। মোহিনী বলেছিল Plane accident-এ তার মৃত্যু হবে। তার মৃত্যু হোল ধরতে গেলে একরকম accident-এই আর প্লেন থেকেই তার মৃত্যু হোল, যদিও একে ঠিক Plane accident বলা চলে না।

আমি বললাম—"আমরা অবচেতন মন নিয়ে কথা বলছিলাম—না? অবচেতন মন যদি সচেতন হয়ে ওঠে, তাহলে চেতন থাকে কোথায়? এ গল্পটি মনে করুন সেই সমস্যারই একটা সমাধান-সূত্র। বৃষ্টি থেমে গেছে দেখছি এবার তাহলে আমি চলি—Good Night".

মাথাটা একটু হেলিয়ে আমি উঠে পড়লাম।

বম্বেতে গিয়েছিলাম দিন কয়েকের জন্য বেড়াতে। উঠেছিলাম একটা হোটেলে। খাবার অবশ্য হোটেলে খেতাম না—খেতাম কাছাকাছি একটা রেষ্টুরাণ্টে।

সেদিন সন্ধ্যায় ফিরে রাত্রি প্রায় দশটার কাছাকাছি রেষ্টুরাণ্টে—এসে পৌঁছুলাম। রেষ্টুরাণ্ট—হলটা দুই ভাগে বিভক্ত। একভাগে টেবিল চেয়ার পাতা—যাতে যথারীতি আহারাদি চলত। দ্বিতীয় হলটি ছিল বল্ রুম্ বা নৃত্যগীতের আসর। দুটি হলের মাঝখানে কোন দরজা বা দেয়াল ছিল না। ছিল শুধু একটা পর্দার ব্যবধান—যার আধখানা টেনে ফাঁক করা। এ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য গীত গুঞ্জন ধ্বনি যাতে সকলের কানে এসে পৌঁছোয় আর নৃত্য-ভঙ্গি সকলের চোখে পড়ে—এই আর কি!

রেষ্টুরাণ্টে ঢুকে দেখি নাচ তখন সুরু হয়ে গেছে। পাগল-করা সুরে বাজছে ব্যাণ্ড আর সেই সুরের তালে তালে যুবক-যুবতীর দল এর ওর হাত ধরে নাচছে। একটা অদ্ভুত আবেশ আছে সে নাচের—দেখলে আর চোখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে করে না। একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লাম আমি রেষ্টুরাণ্ট হলে।

একটা মেয়ের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হোল। মেয়েটি অসামান্যা সুন্দরী—তার উপরে ভরা যৌবনের যেন ঢল নেমেছে তার সারা অঙ্গে। মেয়েটির সঙ্গে নাচছিল একটা ষাট বছরের বুড়ো। কুঞ্চনরেখা আর লোলচর্মে ঢাকা তার মুখ—কিন্তু কি লালসাটাই না ফুটে বেরুচ্ছিল তার দুটো চোখ দিয়ে। সুরের তালে তালে মাথাটাও নাড়াচ্ছিল সে, যেন মনের খুশী আর বেঁধে রাখতে পারছিল না।

সঙ্গীতের স্রোত ক্ষিপ্র থেকে ক্ষিপ্রতর হয়ে উঠল। ফাগুন যেন আগুন হয়ে ঝরে পড়তে লাগল। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল সকলের মন।

তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ সাগরের মতো উদ্বেলিত—বুড়ো লোকটা হঠাৎ সেই মেয়েটিকে টেনে নিল তার বুকের কাছে আবেগভরে—তারপর অজস্র চুম্বন ধারায় ভরে দিল তার মুখ। আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল সেই তরুণী। নাচ থেমে গেল। হোটেলের ম্যানেজার নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন হলে। চারিদিকে শুরু হোল কলরব।

নেহাৎ বুড়ো বলেই তাকে কিছু করা হোল না—নইলে দু-এক ঘা পিঠে পড়ত তার নিশ্চয়ই। অস্পষ্ট ভাবে Apologise করে বুড়ো নাচের আসর ছেড়ে চলে এল—এসে বসল আমার পাশে। নাচ আর শুরু হোল না, তবে আবার নতুন সুরে বাজতে লাগল ব্যাণ্ড।

সিগ্রেট কেস্ থেকে একটা সিগ্রেট অফার করলে আমায় বুড়ো। নেবার ইচ্ছা ছিল না—নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে নিতে হোল একটা। সিগ্রেটে অগ্নিসংযোগ করে বুড়ো আমায় বললেন—"আপনি বোধহয় খুবই আশ্চর্য হয়ে গেছেন আমার কাণ্ড দেখে। আরও আশ্চর্য হয়ে যাবেন শুনলে যে এই আমার প্রথম নাচের আসরে নামা আর এই আমার প্রথম তরুণীর অধর চুম্বন মনের এই সাধটা বাকি ছিল—তাই ভাবলাম জীবন শেষ হবার আগে এটা মিটিয়ে নিই।"

"কিন্তু কতখানি বেইজ্জতি হোল আপনার, সেটা কি ভেবে দেখেছেন ?"

"যে সুখটা পেলাম, তার কাছে এ বেইজ্জতি কিছুই নয়। জীবন সৈকতে আছে অজস্র বালি আর ঝিনুকের শুক্তি। সেই সঙ্গে ছড়ান আছে কিছু রত্নও। সেই রতনই হোল ক্ষণিকের সুখ, যা আমি কুড়িয়ে বেড়াই।"

"একে আপনি রত্ন বলেন—এই পঙ্কিল কামনা, এই উদগ্র লালসা !"

"এই জগতই তো কামনার রাজ্য। আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আমার দৃষ্টি খুলে গেছে। আনন্দই মানুষের জীবন—সুখের আশাতেই মানুষ বেঁচে থাকে। শিশুর বাসনা লজেঞ্জ বা টফি;

যুবকের বাসনা যুবতী-সঙ্গ, বৃদ্ধের বাসনা অর্থ, খ্যাতি আর প্রতিপত্তি। যে সংসারত্যাগী যোগী তারও আছে বাসনা। সে চায় কামিনী-কাঞ্চনের চেয়েও যাতে সুখ বেশী, সেই সুখ পেতে। সে কিছু পায় কিনা জানিনা, তবে ভোগের আশাতেই কাটায় সারা জীবন। যারা দুর্ভাগা তারা দুঃখ-দারিদ্র্যের পেছনেই জীবন বলি দেয়; সুখের মুখ তারা দেখতে পায় না কোনদিনই। কিন্তু পেয়েও যারা হারায়, ভোগ-সাগরের তীরে এসেও যারা রয় তৃষ্ণার্ত, এক তুচ্ছ সংসারের মোহে নিজের কামনা নিজের মনেতেই চেপে রাখে যারা, তাদের আমি বলব বঞ্চিত। সকলকে ফাঁকি দেওয়া চলে কিন্তু নিজের মনকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। তাই মন আমার আজ ভোগের তরে হাহাকার করে উঠছে। কিন্তু হায়, হারিয়ে যাওয়া যৌবন আজ ফিরে পাই কোথায়?"

"কিন্তু ভোগের মাঝেই কি তৃপ্তি মেলে মনের?"—আমি জিগ্যেস্ করলাম তাঁকে। ভোগের তৃপ্তি আরও ভোগে, সুখের তৃপ্তি আরও সুখে। যে মদের মাতাল, সে চায় মদ আরও মদ,। পাত্রের পর পাত্র মদিরা পান করেও নেশা তার ছোটে না। ভোগের নেশা হোল জীবনের নেশা। জন্ম-জন্মান্তরেও এ নেশা তেমনিই রয়ে যায়। এমনিতরই ঘুরে চলে জন্ম-মৃত্যুর চক্র, বয়ে চলে সুখের অনন্ত প্রবাহ। সে সুখের যতটুকু হাতে পাই, ততটুকুই তো জীবনের লাভ! তাছাড়া জীবনে আর আছে কি--শুধু দুঃখ, দারিদ্র্য, অনটন আর যাতনা। আজ যে সুখের পরশ আমার মিলল—সেই তো আমার সবার সেরা পুঁজী হয়ে রইল। এমনি মধুর রাত, এমনি মদির গীত, এমন সুন্দরীর অধর পরশ—এ রাত ক'বারই বা জীবনে আসে?"

চেয়ার ছেড়ে ভদ্রলোক উঠে পড়লেন। হাতে হাত মিলিয়ে বললেন—"তাহলে আমি চলি। আবার দেখা হবে কিনা জানিনা। ক্ষণেকের এ জীবন! বুদবুদের মতো কে কখন মিলিয়ে যাবো কে জানে? তবে আজ রাতের এ মধুর স্মৃতির সাথে আপনার কথাও মনে গাঁথা রইল আমার। Adieu।

বুড়োটি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। খানিকক্ষণ পরে আবার শুরু হোল নাচ, আবার শুরু হোল গান—বয়ে চলল অফুরন্ত বিলাসের স্রোত। কতক্ষণ তা জানি না, তবে নৃত্যোৎসব থেকে যখন পথে এসে দাঁড়ালাম, রাতের বেশীর ভাগটাই তখন কাবার হয়ে গেছে।

আমার হোটেলে ফেরার শর্টকাট রাস্তা ছিল একটা গলি দিয়ে। বড় রাস্তা দিয়ে সে গলির পথে পা বাড়ালাম। জ্যোৎস্নায় ভরে গেছে সারা আকাশ, শীতল নৈশ বাতাস চোখেমুখে ঝাপ্‌টা দিচ্ছিল আর সে হাওয়ায় ভেসে আসছিল কাছের কোন পার্ক থেকে মিষ্টি হাস্নু-হানার সুবাস।

গলিটার পাশে একটা বটগাছ ছিল। ঘন বিন্যস্ত ডালপালার ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্না সেখানে সৃষ্টি করেছিল এক আলোছায়া—যার খানিকটা স্পষ্ট আর তারও বেশী অস্পষ্ট।

বটগাছের নীচে দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ মুখে একটা শীতল পরশ পেলাম। চমকে চেয়ে দেখি, সেটা মানুষের পা। উপরে তাকালাম। দেখি, দেহটা ঝুলছে বটগাছের একটা ডাল থেকে—একটা দড়ির ফাঁস আটকান আছে সে দেহের গলায়। চিৎকার করে উঠলাম আমি, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুচ্ছিল না আমার ভয়ে। ভাগ্যক্রমে কাছাকাছি এক কনষ্টেবল ছিল রাউণ্ডে। আমার ডাক শুনে সে সেখানে এসে উপস্থিত হলো।

মৃত দেহটা নীচে নামান হোল। দেখি, সে আর কেউ নয়—সেই বুড়োটি, যার সঙ্গে কিছুক্ষণ আগে আমার দেখা হয়েছিল রেষ্টুরাণ্টের প্রমোদ কক্ষে।

পরের দিন খবরের কাগজে পাঠ করলাম সেই একই দুর্ঘটনার বিবরণ। বুড়োটির পরিচয় তাতে ছিল। নাম তাঁর দৌলতজী মেহতা—বোম্বাইয়ের বিখ্যাত ধনকুবের ব্যবসায়ী তিনি। কিন্তু শেয়ার খেলায় তিনি সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন গত এক মাসের মধ্যেই। ঋণে আকণ্ঠ

মজ্জমান হয়েছিলেন তিনি, যা শোধ দেওয়া ছিল তাঁর সাধ্যাতীত। দুটো পথ খোলা ছিল তাঁর সামনে—ভারতের লক্ষ লক্ষ পথের ভিখারীর একজন হওয়া, অথবা দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নেওয়া। বলাবহুল্য দ্বিতীয় পথটাই বেছে নিয়েছিলেন দৌলতজী মেহতা। এক রাত্রির তরে জীবনকে উপভোগ করে, মরণকে তিনি বরণ করে নিয়েছিলেন।

আবু হোসেনের রাজত্ব

স্টীমার এসে লাগল পাটনার দীঘা ঘাটে। পূব আকাশে তখন সবেমাত্র দেখা দিয়েছে আলোর ছটা। আকাশের অপরদিকে তখনও দপ্ দপ্ করে জ্বলছিল শুকতারাটা।

হীরালাল স্টীমারের রেলিংটার ওপরে ভর দিয়ে তাকিয়ে রয়েছিল পাটনা শহরের দিকে। কত পুরাতন অথচ চিরনতুন এই শহর। যতবারই এখানে আসে, ততবারই যেন নতুন মনে হয় এ শহরকে। এবারে সে এ শহরে আসছে অনেক দিনের পর। ওঃ, আটবছর—দীর্ঘ আট বছর কেটে গেছে তার শেষবার পাটনা শহর ছাড়ার পর ।

কুলিরা মালপত্র নিয়ে ওঠানামা করছিল, ভোরের আলোতে নদীর ঢেউগুলি ঝিক্‌মিক্ করছিল। সামনের চুনকাম করা বাড়িগুলোর দেওয়াল থেকে বেরুচ্ছিল একটা সাদা আভা। টালি দেওয়া ছাতগুলো দেখাচ্ছিল যেন তুলি দিয়ে আঁকা। একটা যেন স্নিগ্ধ আবেশ জড়ান আছে সারা শহরটায়।

ওঃ, আজ আটবছর পরে সে পাটনায় আসছে। কত ঝড় বয়ে গেছে তার জীবনের উপর দিয়ে এই আট বছর। ঝড়ের শেষে আবার নীড়ে ফিরে আসছে পাখী। শিকল ছেড়া পাখীর মতো আজ সে মুক্ত-পক্ষ। মন চাইছে সীমাহীন আকাশে উড়ে যেতে ডানা মেলে। মুক্তি! মুক্তি !! চিরবাঞ্ছিত মুক্তি ! এতদিন মুক্তির স্বপনই সে দেখে এসেছে। কিন্তু মুক্তির আনন্দ যে এমন উন্মাদিনী, আগে সে কি তা জানিত ? এ যেন দীর্ঘ নিদ্রার পর বসন্ত দিনের এক সকালে জেগে ওঠার মতো, এ যেন দীর্ঘ রোগভোগের পর বাহিরে প্রথম পদার্পণের মতো।

আজ মন তার চাইছিল কোন এক সাথীর নিবিড় সাহচর্য, যাকে সে মনখুলে বলতে পারে তার সকল কথা, যাকে সে সুখের ভাগী করে

পেতে পারে তৃপ্তির পরিপূর্ণতা, কিন্তু সে সাথী আজ তার কোথায়? যেতে হবে তাকে সেই খাজা আব্বাসের কাছে, যেখানে যেতে তার মন চায় না। তবু না গিয়েও তার উপায় নেই।

ষ্টীমারের বাঁশীর আওয়াজে হীরালালের চমক ভাঙে। হাঁ, যাবার সময় হয়েছে। যেতে তাকে হবে সেই খাজা আব্বাসের কাছেই। মালপত্র কুলির হাতে চাপিয়ে এ্যাটাচীটা হাতে তুলে নেয় সে। এই এ্যাটাচীটা সে কখনও হাতছাড়া করে না।

দিলরুবা হোটেলে পৌঁছে হীরালাল দেখে, হোটেলের ম্যানেজার আব্বাস্ সবেমাত্র শুরু করেছে তার দাঁতন। দুপাটি দাঁত বার করে আব্বাস্ সাদর অভ্যর্থনা জানাল হীরালালকে।

"এত তাড়াতাড়ি ফিরলে যে—আমি জানতাম আরও চার বছর পরে ছাড়া পাবে।"—আব্বাস সুধাল।

"সে কথা ঠিক, তবে যে সব কয়েদীরা শান্তশিষ্ট হয়ে থাকে তাদের অনেক সময় আগেই ছেড়ে দেওয়া হয়।"

"ভাল, ভাল," আব্বাস বলে, "বড় রোগা হয়ে গেছ দেখছি এতদিন জেলে থেকে। কিছুদিন আরাম করো এখানে—ফের ঠিক হয়ে যাবে। আর এখন তো কোন অর্থের চিন্তা নেই তোমার!"

"—কেন?"

"কলকাতার সে ব্যাঙ্কটা লুঠ হবার পর যে সোনা খোওয়া গিয়েছিল, গভর্নমেণ্ট তো তার কোন হদিশ পায় নি, ব্যাঙ্কও ফিরে পায় নি তা। লোকে বলে সে সোনার হদিশ জানা আছে শুধু তোমারি। আর সে সোনা এতই বেশী যে দুহাতে খরচ করলেও সারাজীবন তোমাকে আর রোজগারের কথা ভাবতে হবে না। ভাল, ভাল, নিজেই তো প্রাণ হাতে করে জোগাড় করেছ ও টাকাগুলো।"

হীরালাল জবাব দিল না সে কথার! আব্‌বাস্‌ আবার সুধায়—"তারপর কি ঠিক করেছ? কি প্ল্যান তোমার ভবিষ্যতের?"

—"আপাততঃ এইখানেই থাকা—যতদিন মন চায় আর কি।"

—"বেশ, বেশ, এ হোটেল তো তোমারি ঘরবাড়ি। থাক যতদিন ইচ্ছে। বড় আনন্দের কথা। পুরোনো বন্ধুদের এখনও ভোলনি দেখছি।

লোভে চক্‌ চক্‌ করে ওঠে আব্‌বাস মিঞার দুটো চোখ।

দিলরুবা হোটেলের দোতলার সবচেয়ে ভাল ঘরখানি পেল হীরালাল। ঘরে ইলেকট্রিক লাইট আছে, টেবিল আছে, চেয়ার আছে, আর আছে ড্রেসিং-এর আলনা, যা হোটেলের আর কোন ঘরে নাই। তাছাড়া পাশেই আছে বাথরুম, যা এ ঘরের আর একটা বিশেষত্ব।

জানলাটা খুলে দিল হীরালাল। ঘরে এসে পড়ল এক ঝলক মিঠে রৌদ্র। নজরে এল উপরের এক ফালি আকাশ আর নীচের বড় রাস্তা, যার উপর দিয়ে চলেছে রিকশার সারি।

একটা সিগ্রেট ধরিয়ে চেয়ারে বসল হীরালাল। ভাবতে লাগল মানুষের অদ্ভূত ভাগ্যপরিবর্তনের কথা। এই তো সেই হীরালাল, দশ বছর আগে যখন সে ম্যানেজারের মোসাহেবী করত আর জুয়া খেলার আড্ডায় ভাগ্যের তল্লাশ করত তখন কে জানত, যে একদিন এই ম্যানেজারই করবে তাকে আদর-আপ্যায়ন, ভূষিত করবে তাকে মাননীয় অতিথির মর্যাদায়, আর না চাইতেই দেবে তাকে হোটেলের সবচেয়ে ভাল কামরাটা। টাকা এমনিই জিনিষ এ দুনিয়ায়। ফকীরকে আমীর, আর আমীরকে ফকীর বানাতে টাকার মতো ওস্তাদ আর কিছু নেই।

দরজাটা বন্ধ করে এ্যাটাচীটা খুলল সে। স্তবকে স্তবকে নোটের সারি এ্যাটাচীর ভেতরে। হাত দিয়ে পরশ নিল সে নোটগুলোর। এই তো তার জীবনের সবকিছু। তার জীবন দিয়ে রোজগার করা

এ টাকা। নিজের গায়ের রক্তের চেয়েও এ টাকা তার দামী। না, এর এক পয়সাও নষ্ট করবে না সে জুয়া খেলে।

কিন্তু পুরোনো অভ্যেস এত সহজেই যদি ছাড়া যেত! বিকেল হতে না হতেই, হীরালাল হাজির হয় হোটেলের জুয়া খেলার আড্ডায়—সেই আট বছর আগেকার অভ্যাসের বশেই।

সেই জীর্ণ পচা কামরা। টেবিলের উপর ছড়ানো একরাশ তাস, কড়ি আর ঘুঁটি। মত্ত-কোলাহলে ভর্তি সারা ঘরটা—সিগ্রেটের কটু ধোঁওয়া আর তীব্র মদের গন্ধে ছেয়ে আছে সারা বাতাস। অনেক নতুন লোক এসে জুটেছে এখানে, কিন্তু সেই পুরোনো লোকগুলো এখনও রয়েছে—সেই ছুঁচোলো দাড়িওয়ালা ইহুদি আব্রাহাম্, সেই পাকনো গোঁফ আর ছড়ি হাতে বানিয়া জোয়ালা প্রসাদ আর সেই ধুরন্ধর বাঙ্গালী তনয় অনিল গুপ্ত। খেলা পুরোদমে চলেছে। ঝনাৎ ঝনাৎ করে টাকাগুলো হচ্ছে একহাত থেকে আর এক হাতে হস্তান্তরিত। উৎকট লোভ ফুটে বেরুচ্ছে খেলোয়াড়দের চোখ মুখ থেকে—যেন খুদ্ শয়তান ভর করেছে তাদের কাঁধে।

ভাল লাগল না হীরালালের। এ আব্হাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারছিল না সে। হাঁ, কিছুদিন সময় যাবে, খাপ খাইয়ে নিতে।

ঘরথেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল হীরালাল। দরজার কাছে মুখোমুখী দেখা হয়ে গেল তার সঙ্গে নর্তকী নূরবাঈ-এর। হীরালালকে দেখতে পেয়েই, নূরবাঈ এসে তার হাত দুটো ধরলে। বললে—"এই যে হীরালাল। কবে ফিরলে তুমি?

—"লোকে বলে টাকার পাহাড় জমিয়ে তুলেছ তুমি ব্যাঙ্ক লুঠ করে?"

—"লোকে যা বলে তার সব সত্য নয়।"—হীরালাল জবাব দেয়।

—"এতদিন পরে যখন দেখা পেয়েছি তোমার, চল, আজ আর ছাড়ছি না।"

নূরবাঈ হীরালালকে নিয়ে এল একেবারে হোটেলের খাবার হলেতে। বলল—"বল, কোন শরাব আনতে দিই তোমার জন্যে ?"

—"শরাবের দরকার কি ? শরবৎই তো ভাল।"

—"তাই নাকি ? মদের পিপে তুমি, মদে অরুচি হোল কবে থেকে ?"

—"এত মদ খেয়েছি জীবনে যে মদের রুচি আজ চলে গেছে। যত মদ খেয়েছি, তত শরবৎ আমি খাইনি। সেইজন্যেই শরবতের কথা বলছিলাম আর কি ?"

—"সত্যি নাকি ?"—হীরালালের দিকে একটা কটাক্ষ হেনে নূরবাঈ প্রশ্ন করল। 'তারপর আনতে দিল দু গ্লাস শরবৎ। শরবৎ এলে একটা গ্লাসে একটু sip করে, সেটা তুলে দিল হীরালালের হাতে।

সেই পুরাতন ঢঙ, কিন্তু আট বছর আগেকার নূরবাঈ আজ আর সে নেই। যৌবনের বন্যায় আজ তার পড়েছে ভাঁটা, দেহের সারা অঙ্গে দেখা দিয়েছে মেদের বাহুল্য।

—"আজ কতদিন পরে তুমি ফিরেছ," নূরবাঈ বললে,— "এতদিন তোমার কথাই ভাবতাম হীরালাল। অনেক রাত্রেই ঘুম হোত না তোমার কথা ভেবে।"

" —সেটা আমার সৌভাগ্য।"

—"এতদিন তোমার প্রতীক্ষায় ছিলাম। আর মন মানে না। চল, আমরা দুজনে বাঁধি নিজেদের ঘর। চলে যাই দূরে, অনেক দূরে—সেখানে থাকব শুধু তুমি আর আমি।"

বলতে বলতে আবেশে চোখ দুটো বুঁজে নূরবাঈ। সব মেয়েমানুষের স্বভাবই এই। রূপযৌবন যখন দেহ থেকে পালাই-পালাই করে, তখন মরিয়া হয়ে খোঁজে সে আশ্রয়। সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা তারা—আশ্রয়তরুবিনা কেমন করে বাঁচবে এই কঠিন নিষ্ঠুর ধরায় ?

—"এত লোক থাকতে হঠাৎ আমায় নিয়ে যাবার সখ হোল কেন তোমার ?" —হীরালাল সুধাল।

—"তার কারণ আমি তোমায় ভালবাসি—আমার সারাটা মন দিয়ে তোমায় ভালবাসি যে হীরলাল। একি তুমি সত্যিই জান না ?"

—"এত দরদ কোথায় ছিল আট বছর আগে, যখন হীরালাল ছিল একজন কাঙাল ভবঘুরে, জুয়োখেলার আড্ডার একজন লোফার ? সেদিন একবারও তাকিয়েছ চোখ তুলে এই গরীবের উপর ? আজ আমার পকেটে শুনছ রূপোব ঝন্‌ঝনি, তাই এরূপোর ভারে তোমার মনও আজ ডুবেছে।"

—"কি বলতে চাও তুমি ?"—নূরবাঈ-এর তু'চোখে তু'টুকরো আগুনের ফুলকি।

"আমার সব সহ্য হয়, কিন্তু এ প্রেমের অভিনয় আমার অসহ্য।" —শরবৎটা এক চুমুকেই শেষ করে উঠে চলে এল হীরালাল।

হোটেল থেকে বেরিয়ে চলে এল সে। তারপর পাটনার পথে পথে ঘুরে বেড়াল অনেকক্ষণ। সারা মন তার বিতৃষ্ণায় ভরে গিয়েছিল। সেই নোংরা হোটেল, সেই জুয়োখেলার জঘন্য আড্ডা, সেই শয়তানের অনুচরদের সঙ্গে নিত্য কারবার করা —আর তার বরদাস্ত হচ্ছিল না। অথচ এছাড়া জীবনে কি থাকতে পারে— তাও সে ভেবে পাচ্ছিল না।

হীরালাল যখন গোলঘরের সামনে এসে পৌছুল, তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। গোলঘর নবাবী যুগে তৈরী করা এক বিরাট গোলাঘর। একটা ছোটখাট পাহাড়ের মতোই এই গোলঘর—পাটনার মধ্যে সবচেয়ে উঁচু এর চূড়া। হীরালালের ইচ্ছা হোল এর উপর চড়তে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল সে উপরে—খানিকক্ষণের মধ্যেই সে পৌছে গেল গোলঘরের মাথায়।

হঠাৎ তার চোখের সামনে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল এক অপূর্ব দৃশ্য। সারা মন তার ভরে উঠল আনন্দে। মনে হোল, সার্থক হয়েছে তার

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চড়া, সার্থক হয়েছে তার আজ সন্ধ্যায় হোটেল থেকে বেরুনো। সবুজ, সবুজ আর সবুজ—দিগন্ত আবধি যতদূর দেখা যায় শুধু সবুজ। পাটনা শহরে যে এত গাছপালা আর এত বাগান আছে—কে জানত? পূবে দেখা যায় পাটনার লন—যেন সবুজ মখমলে মোড়া। তারই ধারে ঐ বড় বড় বাড়িগুলো—কত ফুল ফুটে রয়েছে তাদের বাগানে। এধারে দেখা যায় জুজবা মহল্লার বসতিবিরল জমিগুলো। বেশীর ভাগটাই ঝোপঝাড় আর জঙ্গল, নানা ফুলের বিচিত্র সাজে সাজান। কোথাও এক একটা শিমূল গাছ লাল ফুলে চারিদিক আলো করে আছে, কোথাও বা কল্কে ফুলের ঝোপে গাঢ় হলদে রঙের ছোপ—কোথাও বা চন্দ্রমল্লিকা আর বন-কলমীর বিচিত্র বর্ণাঢ্যরূপ। আর চারিদিকের এই চোখজুড়নো শ্যামলিমার মধ্যে দেখা যায় মানুষের তৈরী বসতি। কত ছোট ছোট আর কত সুন্দর সেগুলো—যেন তাসের বাড়ির মতো দেখাচ্ছে। কোনটার বা টালির ছাত, কোনটা বা খড় ছাওয়া, আর কোনটা বা পাকা মহল—কিন্তু প্রত্যেকটাই যেন নিজের নিজের মতো সুন্দর। এখান থেকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন তারা মাটির গড়া নয়, যেন তারা এক অপূর্ব কল্পনার সামগ্রী।

কত শান্ত আর কত মধুর এ ছবি। দেখে সারা মন উদাস হয়ে উঠে, ভুলে যেতে ইচ্ছে করে নিত্যদিনের তুচ্ছ সংসার যাত্রার কথা। ওপারের আকাশটা লাল করে সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। বিদায়ী আভায় সারা নদীর জলটা হয়ে গিয়েছে লাল—বালিঢাকা পাড় থেকে বিকীর্ণ হচ্ছিল একটা স্নিগ্ধ রক্তিমাভা। সে রক্তিমাভার পরশ যেন হীরালালের অন্তরের অন্তঃস্থলে পৌঁছুল। তার উদ্বেলিত হৃদয় যেন এক মুহূর্তে হয়ে গেল শান্ত। এ যেন সেই অনুভূতি, যা ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নাবিকের মনে জাগে, তীরের দেখা পেয়ে, যা পিপাসিত যাযাবরের মনে জাগে মরুদ্যানে পৌঁছে।

সত্যি, কি সুন্দর এই জগৎ—দুচোখ দিয়ে দেখেও যেন আশ

মেটেনা চোখের। হিংসা আর কুটিলতায় ভরা। এতদিন কি পেয়েছে সে? কয়েক মুঠো রূপো ছাড়া আর কিছুই নয়—আর তার বদলে খুইয়ে এসেছে নিজের সবকিছু। জীবনের বিচিত্র ঐশ্বর্য ছড়ান চারিধারে—কিন্তু সে দিকে কখনও কি চোখ মেলে চেয়েছে সে? হাতচাপা দিয়ে রেখেছে সে চিরদিন নিজের চোখকে। আজ অনেক দিন পরে যেন তার হারান দৃষ্টি খুলে গেল। নিজের মনের দর্পণে নিজেকে দেখে, আজ স শিউরে উঠল। এই সুন্দরের রাজ্যে এক অসুন্দর সে—এত অশুচি তার জীবন!

নাঃ, এ জীবন তাকে বদলাতে হবে--পুরাতন জীবনের জের আর টনবে না। নাট্যমঞ্চে এক দৃশ্যের পর আর এক দৃশ্য শুরু হবার আগে যেমন পড়ে যবনিকা, আজ তেমনি তার পুরাতন জীবনের উপর পড়বে এক যবনিকা। তস্কর, জুয়াচোর, মাতাল, হীরালালের আজ মৃত্যু হবে—আর তার জায়গায় জন্ম নেবে এক নতুন মানুষ।

হোটেলে ফিরে এসে আব্বাস মিঞাকে সে সুধাল—কতটাকা বাকি আছে তার নামে—সব পাওনা মিটিয়ে দিতে চায় সে আজ।

—"কেন, কি এত তাড়া পড়েছে যাবার"? আব্বাস বললে,—"কিছুদিন থেকেই যাওনা। এই তো সবে এলে—পুরনো বন্ধুর কাছে কটা দিন কাটাতে কিসের আপত্তি?"

আব্বাসের চোখে বিষণ্ণতার ছায়া। হীরালালের নোটভরা এ্যাটাচীটা হাত করতে পারে নি—বোধকরি সেই দুঃখে।

"আর যেখানেই থাকি," হীরালাল জবাব দিলে,—"এখানে আর এক মুহূর্তও থাকব না। শয়তানের কবল থেকে অনেক কষ্টে মুক্তি পেয়েছি—আর শয়তানের ফাঁদে আমি পা দিতে চাই না। আর শোন আব্বাস, আজ থেকে আমি নূতন জীবন আরম্ভ করব, পুরাতন হীরালালকে তোমরা ভুলে যেও, আমিও ভুলে যাব তোমাদের। মনে রেখ, তোমার সঙ্গে যদি কখনও আমার দেখা হয়—না আমি

চিনব তোমাকে, না তুমি চিনবে আমাকে। আজকের পর থেকে হীরালাল বলে আর কেউ থাকবে না তোমাদের দুনিয়ায়।"

হোটেলের পাওনা চুকিয়ে দিয়ে হীরালাল বেরিয়ে এল এ্যাটাচীটা হাতে করে। বাকি জিনিষগুলো পড়ে রইল হোটেলে, তার পুরনো দিনের স্মৃতি বহন করতে।

একটা ছোট বাড়ী সে কিনলো কদমকুয়ায়—যেখানে পাটনার সবচেয়ে সৌখীন আর অভিজাত শ্রেণীরা বাস করে থাকেন। বাড়ীটি ছোট হলেও আরামের। আধুনিক জীবনের সবরকম উপকরণই ছিল তার মধ্যে। ছোট এক ফালি বাগান বাড়ীটির সামনে—নানা রকম ফুলের গাছে ভরা। গেটেতে লটকান ছিল গৃহকর্তার নাম—হীরালাল নয়, হীরালালের নূতন নাম 'মদনমোহন'।

সন্ধ্যের সময় একদিন হীরালাল বাড়ীর সাজানো-গোছানোর কাজ করছিল, এমন সময় কানে এসে পৌঁছুল নারীকণ্ঠের এক মধুর সুর—প্রতিবেশী প্রফেসার জ্ঞানচাঁদের বাগান থেকে। কি যেন এক মাদকতা ছিল সে সুরে, যা উপেক্ষা করতে পারল না হীরালাল। বাগানের পেছনের গেট দিয়ে ঢুকে সে হাজির হলো গায়িকার সামনে।

একটা বটগাছের তলায়, এক বেঞ্চির উপর বসে একটি সুশ্রী তরুণী গান গাইছিল। হীরালালের আগমনে গান তার থেমে গেল। জিজ্ঞাসুনেত্রে চাইলে সে হীরালালের পানে।

—"ভারি সুন্দর গাইতে পারেন আপনি," হীরালাল বললে, "আপনার গান আমায় এখানে টেনে এনেছে—ফুলের গন্ধ যেমন টেনে আনে ভ্রমরকে!"

—"সে আমার সৌভাগ্য।"—মেয়েটি জবাব দিল।

—"সৌভাগ্য আপনার নয়, আমার। এখানে না এলে আপনার

দেখা পেতাম না। আপনার গান সুন্দর ঠিকই, কিন্তু তার চেয়েও ঢের সুন্দর আপনি নিজে।"

—"শুনেছি কবির দৃষ্টিতে সবই সুন্দর বলে মনে হয়।"

—"প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এক একটি কবি লুকিয়ে থাকে সৌন্দর্যের পরশ পেলে তার কবি-দৃষ্টি খুলে যায়। সত্যি, অতুলনীয় আপনার রূপ।"

মেয়েটি লজ্জা-রাঙা মুখ নত করলো। তারপর বললে, - "আপনার একথা মানতে পারলাম না। দেখুন, কেমন নীল ওপরের আকাশ—"

—"তোমার চোখের তারার মতো নয়!"

"দেখুন, কি সুন্দর এই লাল গোলাপগুলো—"

—"তোমার অধরের কাছে এর লালিমা হার মানে।"

—"দেখছেন, আকাশে ঐ চাঁদ উঠেছে।"

—"আর দেখ, তোমায় দেখে লজ্জায় ও মেঘে মুখ লুকাল।"

—"নাঃ, আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না।"—মেয়েটি হেসে পালিয়ে গেল সেখান থেকে।

তারপর পিছু পিছু হীরালাল এল বাগান থেকে বাড়ীর ড্রইংরুমে। সেখানে তার সাথে সাক্ষাত হলো প্রফেসার জ্ঞান-চাঁদের।

নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে হীরালাল বলল যে, সে একজন কলকাতার ব্যবসায়ী। ব্যবসা উপলক্ষ্যে একদিনের জন্য পাটনায় এসেছিল সে—কিন্তু শহরটা এতই ভাল লেগেছে তার যে সে স্থির করেছে এখানেই বাস করবে একটা বাড়ী নিয়ে।

খুশী হয়ে প্রফেসার জ্ঞানচাঁদ বললেন,—"ভালই হোল, তুমি এলে আলাপ করতে, নইলে আমিই ভাবছিলাম তোমার কাছে যাব। এবাড়ীতে আছি তো শুধু আমি আর আমার মা-মরা মেয়ে মাধুরী —একজন গল্প করার সঙ্গী তাই বড় খুঁজছিলাম। আজ থেকে

তুমি আমাদের বাড়ীর একজন হলে। যখনি মন চাইবে, এখানে চলে এস।"

সবিনয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে হীরালাল।—"পাটনা শহরের জীবন কেমন লাগছে?" প্রফেসার সুধান, "কলকাতার থেকে তফাৎ বোধ করছ নিশ্চয়ই?"

—"এজায়গার সবই ভাল, শুধু একটা অসুবিধে—সময়ের চাকা বড় আস্তে আস্তে ঘোরে এখানে।"

—"চাকা জোরে ঘোরাবার উপায়ও আছে এখানে। জানতে চাও তো চল, তোমায় একদিন নিয়ে যাই বাঁকিপুর ক্লাবে। আমি ঐ ক্লাবের মেম্বার। তাছাড়া এ শহরের নতুন অতিথি তুমি—তোমার সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দেওয়াটাও আমার কর্তব্য।"

পরের দিন সত্যিই প্রফেসার জ্ঞানচাঁদ নিয়ে গেলেন হীরালালকে বাঁকিপুর ক্লাবে। গঙ্গার ধারে মনোরম ক্লাবটি। রাত্রিতে সারা গঙ্গার জল ঝলমলিয়ে ওঠে আলোকিত ক্লাবের প্রতিবিম্বে। সুইমিং পুল আছে, টেনিস কোর্ট আছে, আর আছে আধুনিক সভ্যতার সব রকম খেলা আর আমোদের উপকরণ। অন্যান্য ক্লাবের মতো বল-ডান্সের সঙ্গে মদিরার প্রাবহ অবাধেই চলে এখানে। একবার ঢুকলে আর বেরিয়ে আসতে ইচ্ছে করে না, নেশায় শ্লথ পা দুখানি বহন করে।

অনেক গণ্যমান্য লোকের সঙ্গে হীরালালের পরিচয় হোল এখানে। পরিচয় হোল মারোয়াড়ী ধনকুবের বানোয়ারী লালের সঙ্গে, কাঁচা চামড়ার ব্যবসা করে যিনি সহস্রপতি থেকে লক্ষপতি হয়েছেন—দেহের স্থূলতা পুষিয়ে নিয়েছে তাঁর দৈর্ঘ্যের খর্বতাকে, পরিচয় হোল কংগ্রেস এম-এল-এ. সরযূ প্রসাদের সঙ্গে,—গান্ধী টুপির নীচে তাঁর ধূর্ত চোখদুটো শ্যেন পাখীকে স্মরণ করিয়ে দেয়, আর পরিচয় হোল

হার্ট স্পেশালিষ্ট ডাক্তার ভারমার সঙ্গে—এঁর মতো মদের পিপে পাটনা শহরে নাকি দুটো নেই। সেই জুয়াখোলার আড্ডার পুরোনো খেলোয়াড় আব্‌রাহামের সাথে প্রফেসার হীরালালের পরিচয় করিয়ে দেয়। ছুঁচোলো দাড়িওয়ালা ইহুদিটা হীরালালকে সেখানে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল, তবে মুখে কিছু বললে না। হীরালালও তাকে এড়িয়ে গেল যথা সম্ভব।

অনেক মহিলাও ছিলেন সেখানে, তবে বেশভূষা তাঁদের প্রায় একই রকম। সাপের খোলসের মত পাৎলা আর চিক্কণ শাড়িতে জড়ানো তাঁদের দেহ, আর মুখে নানা রঙের প্রলেপে ঢেকে রেখেছিল তাঁদের আসল রঙকে। মহিলাদের মধ্যে কেউ সিগ্রেটখান, কেউ সুরা পান করেন আর কেউ ভালবাসেন খেলতে অবাধ প্রেমের লীলা।

হ্যাঁ, পাটনার অভিজাত সম্প্রদায়। আজ হীরালাল শুধু এদের সঙ্গে পরিচিত নয়, এদের একজনও বটে। আজ সে নিজেকে আনায়াসে অভিহিত করতে পারে একজন ভদ্রলোক বলে—অভিজাত গোষ্ঠীর। এসব লোকদের সে চিরদিন ঈর্ষা করে এসেছে, এই জীবনের স্বপ্ন সে কতবার দেখেছে। কে জানত যে তার এতদিনের স্বপ্ন একদিন সত্যিই বাস্তব হবে!

এদিকে প্রফেসারের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা দিন দিন বেড়েই চলেছে সেই সঙ্গে রঙ্গিন প্রেমের ছোঁওয়াও লাগছে তার মনে—মাধুরীর মুখ যেন সে ভুলতেই পারে না কোন সময়ে। কে জানে মাধুরীর মনেও সে ছোঁওয় লেগেছে কি-না। হয় তো লেগেছে, নইলে সে এলে কেন মাধুরী সব কাজ ফেলে আসে তার কাছে, সে চুপ করে থাকলে কেন অজস্র প্রশ্নবাণে মাধুরী তাকে বিব্রত করে তোলে? কেন না চাইতেই মাধুরী তার দিকে এগিয়ে দেয় ধূমায়িত কফির পেয়ালাখানা?

এই সব কথাই সেদিন রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবছিল হীরালাল। বারবারই তার মনে পড়ছিল, বেচারা আবু হোসেনের কথা, যাকে দারিদ্র্যের অন্ধকূপ থেকে তুলে একদিনের জন্য করে দেওয়া হয়েছিল বাগদাদের বাদশাহ্। সেক্রেটারিয়াটের ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত্রি বারটা বেজে গেল। তারপরেই শুনতে পেল সে কলিং বেলের তীব্র আওয়াজ। দরজা খুলেই দেখে সামনে দাঁড়িয়ে আছে মাধুরী, আলুলায়িত তার কেশ, বিস্রস্ত তার বেশ, চোখের দৃষ্টি কেমন যেন বিস্ফারিত।

—"আপনাকে এখুনি একবার আসতে হবে" মাধুরী বললে,— "বাবা কেমন যেন করছেন। বোধহয় কিছু একটা হয়েছে তাঁর। আমার বড় ভয় করছে।"

"চল, এখুনি আসছি আমি," তাকে আশ্বস্ত করল হীরালাল। তাড়তাড়ি তৈরী হয়ে সে বেরিয়ে পড়ল মাধুরীর সঙ্গে, সঙ্গে নিতে ভোলে নি সে একটা শিশি, যা তার এক ডাক্তার বন্ধু তাকে উপহার দিয়েছিলেন বাজী খেলায় হেরে। লক্ষ টাকার চেয়ে দামী এই অ্যামিল নাইট্রাইটের শিশি। ডাকতার বন্ধু বলেছিলেন তাকে, "যদি কখনও হঠাৎ মনে হয় যে বুকে অসহ্য ব্যথা, প্রাণটা খাবি খাচ্ছে, দমটা বেরিয়ে যাচ্ছে, তবে এ ওষুধ শুকেঁ দেখো —ঠিক হয়ে যাবে তুমি।"

প্রফেসার জ্ঞানচাঁদের শয়নকক্ষে ঢুকে হীরালাল দেখল প্রফেসার সাহেব ছটফট করছেন বুকের যন্ত্রণায়। চোখ তার বুঁজা, মুখ ফ্যাকাশে। তাঁকে দেখেই মাধুরী লুটিয়ে পড়ল কান্নার ভারে। হীরালাল আর সময় নষ্ট না করে সিল্কের রুমাল দিয়ে জড়িয়ে ভেঙে ফেলল ওষুধের অ্যামপুলটা। তারপর সেটা তাড়াতাড়ি প্রফেসারের নাকের কাছে ধরল তুলে।

খানিকক্ষণ পরে প্রফেসার চোখ মেলে চাইলেন। হীরালাল আর মাধুরীকে ইশারায় ডাকলেন কাছে। হীরালালের হাতটা

নিজের হাতে নিয়ে তিনি বললেন—“শোন মদনমোহন, আমি মরতে চলেছি। কিন্তু মনে আমার শান্তি নেই। আমার এই মা-মরা মেয়ে মাধুরী—কাকে দিয়ে যাব একে ? আমি গেলে কেউ এর দেখবার থাকবে না। বল, তুমি এর ভার নেবে- আজ তুমিই আমার সব ভরসা।”

হীরালাল নীরবে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাল। তার হাত আর মাধুরীর হাত দুটো প্রফেসার মিলিয়ে দিলেন একসঙ্গে। তার পরে সেখান থেকে উঠে এল। তাড়াতাড়ি ছুটল সে ডাক্তারের বাড়ী।

ডাক্তার সাহেব এসে প্রফেসারকে ভাল করে পরীক্ষা করলেন। হীরালালের শিশিটাও দেখে নিলেন সেই সঙ্গে। বললেন তিনি,—

“এই ওষুধই প্রফেসারকে সুস্থ করেছে। Angina Pectoris হয়েছিল তাঁর। যাই হোক, খুব সাবধানে একে এখন রাখতে হবে—একেবারে পরিপূর্ণ আরামে।”

প্রফেসার দিন দিন সেরে উঠতে লাগলেন। কিন্তু এই ঘটনার পর থেকে মাধুরী আর হীরালালের মধ্যে যেটুকু সঙ্কোচের বাধা ছিল তা একেবারেই চলে গেল, এরপর প্রায়ই তারা মিলত গোপনে, আলাপ করত নিভৃতে আর বেড়াত একসাথে বাগানে। প্রফেসার দেখেও এসব দেখতেন না বরং মনে মনে খুশীই হতেন তিনি।

একদিন সন্ধ্যায় পূর্ণিমার চাঁদ হাসছিল নীল আকাশে আর পাতায় পাতায় মর্মর ধ্বনি তুলছিল সাঁঝের হাওয়া। বাগানে হাসনুহানার ঝোপের পাশে আলোছায়ার আল্পনা—সেখানেই এক কাঠের বেঞ্চে বসেছিল হীরালাল আর মাধুরী। মাধুরী সুধাল,—“এই চাঁদ আকাশে, এই তুমি আর এই আমি। তবুও আজ এত

উদাস কেন তুমি মদন? বলবে না আমায়, তোমার কি মনের ব্যথা?"

মদনের চোখ থেকে তুচার ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। বললে সে, —"বিশ্বাস করো মধুরী, আমি কাঁদছি তুঃখে নয়, অনেক সুখে। এত সুখ বোধহয় জীবনে আমি কোনদিন পাইনি। তাই ভাবি, পেয়েও যদি তোমায় হারাই—এত সুখ কি সত্যিই আমার সইবে?"

"একথা বোল না," মাধুরী জবাব দেয়, "অমন করে আমার মনে কষ্ট দিও না। তুমি আমারই আছ, আর চিরদিন আমারই থাকবে।"

—"আর যদি শোন, আমি একজন বদমাইশ, জুয়াচোর, তস্কর—তাহলেও কি তুমি এমনিতরই আমায় ভালবাসবে মাধুরী।"

মাধুরী হীরালালের হাতত্নটো নিজের হাতে তুলে নিল। তারপর হীরালালের মুখের পানে তাকিয়ে সে বলল,—"ওসব কথা আমি বিশ্বাস করি না। আমি জানি আমার মদন কখনও খারাপ হতে পারে না।"

পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। প্রফেসাব জ্ঞানচাঁদ এসে দাঁড়ালেন সেখানে। সিগ্রেটটা ধরিয়ে একমুখ ধোঁওয়া ছেড়ে প্রফেসার বললেন,—"অনেক দিনই ভাবছিলাম তোমাদের Engagement-এর কথা সকলকে জানাব। এখন তো আমি সেরে উঠেছি, ভাবছি আগামী সপ্তাহেই একটা পার্টি দেব প্রিন্স হোটেলে সেই উপলক্ষে। আশা করি তোমাদের অমত হবে না।"

মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে তুজনে। আর কোন কথা হয় না।

প্রিন্স হোটেলের আলোকিত হলঘর—গণ্যমান্য অনেক অতিথির সমাগম হয়েছে আজ সেখানে। এসেছেন মারোয়াড়ী বানোয়ারী লাল, এসেছেন এম. এল. এ. সরযূপ্রসাদ, এসেছেন ডাক্তার ভারমা—এসেছেন আরও অনেকে। প্রফেসার জ্ঞানচাঁদের এক পাশে

বসেছিল মাধুরী—শাদা সিলকের শাড়িতে ভারি সুন্দর মানিয়েছিল তাকে। আর তাঁর এক পাশে ছিল হীরালাল।

প্রফেসার জ্ঞানচাঁদ উঠে দাঁড়ালেন সবাইকে লক্ষ্য করে তিনি বলতে লাগলেন,—"আজ আমার বড় আনন্দের দিন, তাই আপনাদের ডেকেছি আমার আনন্দের ভাগ নেবার জন্য। আজ একটি খবর আপনাদের জানাব—মাধুরীর বিষয়ে আর কি—যা শুনে আপনারা বিস্মিত হবেন, সুখীও হবেন। কিন্তু তার আগে হোক নূরবাঈ-এর নৃত্য। আজকের উৎসবের জন্য বিশেষ করে আনিয়েছি এই বাঈজীকে। আসুন দেখা যাক সেই নাচ।"

সামনের দরজার পর্দাটা কেঁপে ওঠে। নূরবাঈ ঢোকে ঘরে। তারপর বাজনার তালে তালে শুরু হয় নাচ। মদিরার মতোই মদির সে নাচ। কিন্তু হীরালালের মনে হচ্ছিল যেন তা কতকগুলো অর্থহীন অঙ্গভঙ্গি। দ্রুত থেকে দ্রুততর স্পন্দিত হচ্ছিল তার হৃদয় চাপা উত্তেজনায়।

নাচ শেষ হলে নূরবাঈ সোজা ছুটে এল হীরালালের কাছে। তার হাত দুটো ধরে বললে—"একি হীরালাল—কোথায় ডুব মেরে ছিলে তুমি এতদিন? আমায় তুমি ভুললেও, আমি তো ভুলতে পারি না। তুমি যে আমার কলিজা—আমাদের জুয়ার আড্ডার মাণিক।"

নূরবাঈ-এর কণ্ঠ শ্লেষে ভরা, চোখ দুটো থেকে ফুটে বেরুচ্ছিল আক্রোশ। চড়া গলায় প্রফেসার জিগেস করলেন "কি বলছ তুমি যাতা? এর নাম হীরালাল নয়, এ হোল মদনমোহন—হাঁ, কলকাতার ব্যবসায়ী মদনমোহন।"

—"এর নাম মদন হোল কবে থেকে?" নূরবাঈ বললে, চিরকাল তাকে তো আমি হীরালাল বলেই জানি আর সকলেই তা জানে। কলকাতার ব্যাঙ্ক লুঠ করে আট বছর জেল খেটেছে এ, কিন্তু সেই সাথে হাতিয়েছে ও বেশ কিছু টাকা। সেই টাকার গরমেই না আজ

হীরালাল আমায় চিনতে পারছে না। বিশ্বাস না হয়, তো জিগ্যেস করে দেখুন।”

—“এই বুঝি তোমার স্বরূপ?” প্রফেসার রেগে ফেটে পড়েন, “ঠক, বদমাইশ জুয়াচোর।”

হীরালাল সে কথার জবাব দিল না। হাত থেকে Engagement এর আঙটিটা খুলে ছুঁড়ে দিল সে মধুবীর দিকে। তারপর মাথা নীচু করে বেরিয়ে চলে গেল সে হলঘর থেকে।

পাটনার দীঘা ঘাট থেকে স্টীমার ছাড়বার সময় হয়েছে—মাঝ রাতের স্টীমার, সামান্যই তার যাত্রী। শেষ হুইসেল দেবার পরই প্রায় ছুটতে ছুটতে স্টামারে এসে উঠল একটি লোক—বিশৃঙ্খল তাব বেশ, হাতে একটি এ্যাটাচী। হীরালালের উঠার সঙ্গে সঙ্গেই স্টীমার ছেড়ে দিল।

সোজা চলে গেল হীরালাল তার কেবিনে। তারপর টেবিলের উপর উপুড় হয়ে সে লিখতে লাগল এক চিঠি। মাধুরীকে লেখা সে চিঠি। লিখছিল সে—“পুরাতন জীবন ভুলে ভেবেছিলাম নূতন জীবন শুরু করব। আশা ছিল, তুমি হবে আমার জীবন-সাথী। তোমার পরশে ঘুচে যাবে আমার জীবনের যতেক কালিমা, গ্লানি আর দীনতা। কিন্তু একবারও যদি তখন ভাবতাম, আমি কতখানি যোগ্য তোমার কাছে! নরকের জীব আমি, চেয়েছিলাম স্বর্গের দেবীকে, হীন রাহু আমি, গ্রাস করতে চেয়েছিলাম আকাশের চাঁদকে। কিন্তু তা হয় না—হতে পারে না। যত পাপ আমি করেছি—সব কি বৃথায় যাবে? এত সহজেই কি পেয়ে যাব সুখ, শান্তি—জীবনের সকল কাম্য? তাহলে প্রায়শ্চিত্ত করবে কে, অনুতাপের আগুনে জ্বলবে কে, চোখের জলে ভাসবে কে?

স্টীমারের কেবিনে বসে এ চিঠি লিখছি। জানলা দিয়ে নজরে

আসছে পাটনা শহর। কি সুন্দর শহর এই পাটনা! আজ রাত্রির এই আবছা-আঁধারে ভারি সুন্দর আর রহস্যময় দেখাচ্ছে তার রূপ। এ যেন এক স্বপ্নের মতো, এক মায়ার মতো, যা হাতের নাগালে পেয়েও হাত দিয়ে ধরা যায় না, এ যেন এক ছায়ার মতো, যাকে দেখা যায় কিন্তু ছোঁওয়া যায় না। এখানেই রইল আমার যা কিছু সুখ, আনন্দ, যা কিছু সাধ আশা—রইল আমার জীবনের সব কিছু। সব ছেড়ে আমি চললাম—একাকী চিরতরে

আমায় তুমি ভুলে যেও। মনে করো এক ঠগ এসেছিল তোমাদের ঠকাতে—নিজেই ঠকে সে সরে পড়ল চিরদিনের মতো। অথবা জেনো এক ধূমকেতু এসেছিল নিজের আগুনে তোমাদের জ্বালাতে—নিজের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে সে গেল নিভে। বিদায়—চির বিদায়!”

ফটোগ্রাফার

পুরীতে সমুদ্রের ধারে আমরা রোদ পোহাচ্ছিলাম। উপরে আকাশ নীল, যেন মীনে করা। তার উপর দিয়ে ভেসে চলেছিল দু-চারটে সাদা মেঘ, পেঁজা তুলোর মতন। সামনে নীল সমুদ্র দূরে দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। চারিদিকে নীরব, নিস্তব্ধ, নিঝুম। খালি মাঝে মাঝে উড়ন্ত চিলের কা কা আওয়াজ কানে আসছিল।

পিঠে ক্যামেরা ঝোলান এক ভদ্রলোক এসে আমাদের কাছে উপস্থিত হলেন। ভদ্রলোক লম্বা একহারা, গায়ের রঙ রোদে-পোড়া, তামাটে। মাথায় কাঁচা পাকা লম্বা চুল। চোখে একটা সান্ গ্লাস্।

একটা ট্রিপড্ ষ্ট্যাণ্ডের ওপর ক্যামেরাটা বসিয়ে কালো কাপড় দিয়ে নিজের মুখমণ্ডল আর ক্যামেরা ঢেকে ফেললেন তিনি। তারপর অনেকক্ষণ ধরে ফোকাস্ ঠিক করতে লাগলেন সামনের সমুদ্রের।

আমাদের সময় কাটছিল না, যাই হোক একটা সময় কাটাবার উপাদান পাওয়া গেল। কৌতূহলী হয়ে আমরা ঘিরে দাঁড়ালাম ভদ্রলোককে। সেইখানেই দাঁড়িয়ে পর পর আটটা স্নাপ্ তুললেন তিনি।

—"এ সীনের মধ্যে কি এমন পেলেন যে আট-আটটা স্নাপ্ নষ্ট করলেন আপনি?" একটু অধীর কণ্ঠে প্রশ্ন করল সুবিমল। সুবিমল ছিল একটু মুখফোঁড় ধরনের লোক।

ক্যামেরা থেকে ভদ্রলোক মুখ তুলে চাইলেন, ধীর কণ্ঠে বললেন,

—"ওঃ আটটা স্নাপ তুলেছি বুঝি? তবু মনে হচ্ছে ছবির অনেক কিছুই রয়ে গেছে বাকি, অনেক কিছুই রয়ে গেছে দৃষ্টির আড়ালে সব ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে। ঐ নীল আকাশের রহস্য, ঐ সমুদ্রের

গভীরতা, ঐ দিগন্তের ম্লান বিষণ্ণতা—এর কিছুই যেন ধরতে পারলাম না ফটোগ্রাফিক প্লেটেতে।

—"আপনি শুধু একজন ফটোগ্রাফার নন" সুবিমল বললে, দেখছি আপনি একজন দার্শনিক।"

"আমি সামান্য প্রকৃতির উপাসক মাত্র। প্রকৃতির বিচিত্র রূপকে চিত্রিত করাই হলো আমার কাজ। অরূপের মধ্যে আমি করি রূপের সন্ধান, অসীমাকে ধরতে চেষ্টা করি ক্যামেরার সীমার মধ্যে। সারাজীবন ধরে কত জায়গায় যে ঘুরেছি তার ঠিক নেই, কত ফটো যে তুলেছি তার ইয়ত্তা নেই। তবু খুঁজতে চাই, পাই না আর যা পাই, তা চাই না। সব কিছুর ভেতরে থেকে সে সবাইকে ফাঁকি দেয়। জানিনা কতদিনে শেষ হবে এই অশ্রান্ত লুকোচুরি খেলা, কতদিনে ছুটবে তৃপ্তিহীন নেশা। কস্তুরী মৃগের মতো, নেশায় মাতাল হয়ে ছুটছি আমি দেশ-দেশান্তরে—কিন্তু হায়! কে দেবে আমার সে বাঞ্ছিত কস্তুরীর সন্ধান?"

—"এখানে কতদিন আছেন আপনি?" কথাটার মোড় ঘুরিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—"কোন ঠিক নেই, যতদিন ভাললাগে আর কি! তারপর চলে যাব যেখানে হাতছানি দিয়ে ডাক দেবে আমায় প্রকৃতি। আমার সঙ্গে আছে শুধু এই ক্যামেরা—এ আমার সারাজীবনের সাথী। এ হোল লুকাস ক্যামেরা। ভারি সুন্দর আর জীবন্ত ছবি ওঠে এতে দেখুন না—"

ভদ্রলোক ক্যামেরাটা আমাদের হাতে দিলেন। ভদ্রলোকের ক্যামেরাটা নিয়ে আমরা নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। সুবিমলের আগ্রহ সবচেয়ে বেশী, যেন ফটোগ্রাফির সবকিছু তার জানা বোঝা। একটা উঁচু বোতামের মতন জিনিসের ওপর তার হাত পড়তেই ক্যামেরার প্লেটটা খুলে বেরিয়ে এল। ভেতরে কোন ছবির রীল ছিল না—ছিল শুধু দুটো শূন্য স্পুল।

—"আসল জিনিষটা সঙ্গে নিতে ভুলে গেছেন দেখছি, সুবিমল বললে, ।

—"এতো করে ফোকাশ ঠিক করা, এতগুলো স্নাপ্ তোলা—সব বেকার হল।"

—"এটা ঠিক ভুল নয়," ক্যামেরাটা হাতে নিয়ে ভদ্রলোক জবাব দিলেন—"আসলে ফটো তোলা আমার নেশা নয়—আমার পেশা। এই করেই আমি খাই, আর আমার দুটো মা মরা ছেলেদের খাওয়াই। বাজারে আমার ফটো তোলার দোকান আছে—ন্যাশনাল স্টুডিও আপনাদের ফটো তোলার দরকার হলে সেখানে গিয়ে তোলাতে পারেন। —৬০ টাকা দামের—সেল্স্ ট্যাক্স আমারা নিই না।"

ক্যামেরাটা পিঠে ঝুলিয়ে ভদ্রলোক হন হন করে সেখান থেকে চলে গেলেন। আমরা নির্বাক হয়ে সেদিকে চেয়ে রইলাম।

তামাসা

খবরটা শুনে আমরা সকলে একেবারে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। অনীতা কলেজের একজন নামকরা চপল আর ফাজিল মেয় আর রমেশ কলেজের একজন নামকরা নিরীহ আর গোবেচারা ছেলে। আর অনীতার যত চোখা চোখা বিদ্রূপবাণ বর্ষিত হত বেচারা রমেশের ওপরই—অথচ সেই অনীতার সঙ্গেই হবে কিনা রমেশের বিয়ে।

সেদিন ক্লাসে এসে আমরা একেবারে ঘিরে ধরলাম রমেশকে

—"বলতেই হবে আমাদের কোন বাণে বানচাল করলে তুমি তরুণী অনীতার হৃদয় তরণী।"

—শুনতে চাও তো বলছি, যদিও বলবার মত বিশেষ কিছু নেই —অবশ্য শোনার মত ধৈর্য যদি তোমাদের থাকে।

—"শুনতে আমরা এখুনি রাজী, তবে গল্পের সবকিছু বলতে হবে আমাদের—পূর্বরাগ থেকে নিয়ে একেবারে শেষ অবধি।"

—"তথাস্তু শোন তবে। প্রথমে পূর্ববাগ অর্থাৎ পরিচয়ের কথাই বলি। সেদিন কলেজে এসেছিলাম আমি দেরীতে। ক্লাসে না গিয়ে কমনরুমে বসে ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছিলাম আনমনে, এমন সময় ঘরে এসে ঢুকল অনীতা এসেই সে বললে—"যখনই আপনাকে দেখি, তখন হয় লাইব্রেরীতে বসে আপনি বই পড়ছেন, নয় কমনরুমে বসে ম্যাগাজিন পড়ছেন—কেন খেলতে কি আপনার মানা?"

—"না, তা ঠিক নয়।"

—"তবে আসুন, একটু টেবিল টেনিস খেলা যাক"

—"টেনিসই খেলতে পারি না আমি, তো টেবল টেনিস।"

—"যারা টেনিস খেলে না, তারাই তো খেলে টেবল টেনিস। আসুন, আর দেরী করবেন না।"

—"বুঝলাম আপত্তি করা বৃথা। ব্যাটটা হাতে নিয়ে দাঁড়ালাম টেবিলের ধারে। অনীতা যেমন পাকা খেলোয়াড়, আমি ছিলাম তেমনি কাঁচা। ব্যাটটা নিয়ে একটা শট সামলাতে যাব—বলটা সোজা এসে লাগল আমার কপালে সজোরে। সহানুভূতি দেখানো দূরের কথা, একেবারে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল অনীতা। ব্যাটটা টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে সে বললে—"আপনি তো দেখছি একেবারে আনাড়ি।"

বলবার কিছু ছিল না। সত্যিই তো আমি তাই। চোখে হাত দিয়ে বসে পড়লাম আমি পাশের চেয়ারে।

—"দেখি, চোখটা আপনার," আমার পাশে এসে অনীতা বলে, "ওহো, একেবারে লাল হয়ে গেছে যে দেখছি। খুব লেগেছে বুঝি—না? দাঁড়ান, একটা রুমাল ভিজিয়ে বেঁধেদি আপনার চোখে।"

—"বলতে বলতে অনীতার বিদ্রূপের কণ্ঠস্বর যেন এক নিমেষে স্নিগ্ধ শীতল হয়ে গেল।

রুমাল বাঁধা শেষ হলে আমি বললাম—"নাক-কান মলছি আর কখনও তোমার সঙ্গে আমি খেলব না।"

—"উহু, আমার সঙ্গেই খেলতে হবে আপনাকে, নইলে খেলা আপনি কোনদিনেই শিখবেন না। আপনাকে আমি একেবারে পাকা খেলোয়াড় করে ছেড়ে দেব।"

এর কিছুদিন পরের কথা। কলেজ শেষ হবার পর, আমরা বোটিং করছিলাম। আমরা মানে আমি আর অনীতা। দাঁড় চালাতে চালাতে কতদূর গেছি ঠিক খেয়াল ছিল না আমার। হঠাৎ দেখি পশ্চিমের আকাশটা লাল করে ডুবছে সূর্য। অস্ত যাবার বিদায়ী আভায় সারা নদীর জলও হয়ে গেছে লাল। দুধারের বালি ঢাকা পাড় থেকে বিকীর্ণ হচ্ছিল এক স্নিগ্ধ বক্তিমাভা।

—"ভারি সুন্দর দেখতে লাগল—না?" আমি বললাম,—"এই অস্তাচলের Landscape টা?"

—"সন্দেহ নেই, কিন্তু আপনি তো সে দিকে চেয়ে নেই। আপনি তাকিয়ে আছেন আমার মুখের দিকে।"

—"কারণ সেটা আরও বেশী সুন্দর।"

—"সে বিষয়ে অবশ্য যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

—"আমি তো নিঃসন্দেহ।"

হঠাৎ ঠক করে একটা আওয়াজ হলো। সজোরে নড়ে উঠল সারা নৌকাটা। তাড়াতাড়ি দাঁড় চালিয়ে খানিক দূরে চলে গেলাম আমরা। কিন্তু তখন হু হু করে জল ঢুকছে নৌকায়। চড়ায় ধাক্কা লেগে পাটাতনের একটা কাঠ গিয়েছিল খসে।

—"সর্বনাশ, আমি বলি, "নৌকা যে ডুবছে।"

"তাতে আর হয়েছে কি?—সাঁতার কেটে চলে যাব আমরা ওপারে।"

—"কিন্তু আমি যে সাঁতার জানি না।"

—"সাঁতার জানেন না? তা বেশ শক্ত করে চেপে ধরুন আমার কাঁধটা।"

অনীতা পর মুহূর্তে আমায় পিঠে করে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল জলে। বিপন্না নারীর উদ্ধার কর্তার অনেক দৃষ্টান্ত আছে রোমান্টিক গল্পে আর উপন্যাসে, কিন্তু বিপন্ন পুরুষ সিংহের উদ্ধারকর্ত্রী এক অবলা নারী—জগতের ইতিহাসে এই বোধহয় প্রথম।

কলেজের ঘাটে পৌঁছে আমি বললাম—"তোমায় কি বলে ধন্যবাদ দেব অনীতা জানি না। আজ তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ।"

—"চুপচাপ মাথা নীচু করে চলে যান। লজ্জা করেনা আপনার? এত বয়স হলো, এখনও সাঁতার শেখেন নি আপনি।"

মাসখানেক আগে কলেজের পিকনিকটা তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। সেবার সেই জঙ্গলে জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে খেয়ালই ছিল

না আমাদের কেমন করে কেটে চলেছে বেলাটা। অবশেষে খাবার তৈরী করে খেতেই বেলা গড়িয়ে গেল। নীল আকাশের এক কোণে উঁকি দিলে পূর্ণিমার পূর্ণাঙ্গ চাঁদ আর আকাশটা ভরে গেল উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায়। অনীতাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গেলাম আমি নদীর ধারে একটা মস্ত বটগাছের তলায়। ঘনবিন্যস্ত ডালপালার ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলো ঘাসের উপর পড়ে সৃষ্টি করেছিল একটা উজ্জ্বল আলপনা—অনেকটা ফ্লোরেসেন্ট পেন্টের মতো।

—"চাঁদের একটা মোহিনী আবেশ আছে, নয় কি? চাঁদের আলোয় সারা জগৎটাকে মনে হয় যেন একটা স্বপ্ন"—অনীতার মুখের দিকে চেয়ে আমি বললাম।

—"আপনি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখেন বুঝি? নেশা-টেশা করছেন আজকাল?"

—"চাঁদটাকে শেলী বলেছেন—The Lamp of the night."

—"তখন বোধহয় ইলেকট্রিক লাইট ছিল না। হ্যাঁ, বলুন তো আপনার কি দরকার ছিল আমাকে এখানে আনবার?"

—"শোন অনীতা, আজ তোমায় আমি এমন একটা কথা বলতে চাই যা কোনদিন কখনও তোমায় বলিনি।"

—"চটপট শেষ করে ফেলুন আপনার কথা।" বেশিক্ষণ আমি কিন্তু দাঁড়াতে পারব না এখানে। আপনাকে ঠিক এক মিনিট সময় দিলাম।"

"ঠিক এক মিনিটের মধ্যেই শেষ করছি।" ঘড়ির দিকে নজর রেখে আমি বলি,—"শোনো অনীতা, আমি তোমায় ভালবাসি, আমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। তোমায় পেতে চাই আমি—আমার একান্ত কাছে আপন করে। বলো অনীতা, আমার এ আশা সত্যিই কি কোনদিন মিটবে না? এ জীবনে যদি তোমায় না পাই, বিশ্বাস করো, তাহলে আমি আর বাঁচব না।"

—"আহা, অত তাড়াতাড়ি মরবেন না আপনি। আমার কিন্তু

বড আপশোষ হবে। এখনও আপনার সারা জীবনটা রয়েছে বাকি।”

দ্রুতপদে চলে গেল অনীতা সেখানে থেকে। অপমানে কানদুটো আমার লাল হয়ে উঠল। ইচ্ছা হলো তখুনি ঠাস করে একটা চড বসিয়ে দিই ঐ ফাজিল মেয়েটার রুজ’লপ্ত কমনীয় গালে

এ জীবন-নাটকের পরের দৃশ্য সেভয় হোটেলের ৬নং কামরায়। ঘরের কোণে টেলিফোনের রিসিভারটা নিয়ে আমি ফোন করলাম অনীতাকে।

—“হ্যাঁ, আমি রমেশ—আমি বলি, “শোন অনীতা, একবার দেখা করতে পার তুমি আমার সঙ্গে সেভয় হোটেলের ৬নং রুমে? হ্যাঁ এখনই, বড দরকার কারণ? এলেই জানতে পারবে তা।”

রিসিভারটা রেখে দিলাম আমি অল্প সময়ের মধ্যেই এসে পৌঁছে যায় অনীতা। সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে সে প্রশ্ন করে—“কি ব্যাপার? এতরাত্রে আমার ডাক? মাথা-টাথা খারাপ হোল নাকি আপনার?”

—“দরজাটা ভেজিয়ে সামনের চেয়ারে বসো’—শান্ত কণ্ঠে জবাব দিই। অনীতা উপবেশন করলে আমি তার মুখোমুখী হয়ে বসলাম একটা খাটের ওপর। আমার পাশে ছিল একটা বেতের ঝাঁপি।

—“শোন অনীতা, এতদিন শুধু তুমি আমার সঙ্গে তামাশা করে এসেছ, আজ আমি তোমার সঙ্গে একটু তামাশা করতে চাই

—“কি আপনার তামাশা করবার করুন” অনীতা জবাব দেয়।

—“শোন অনীতা, তোমায় আমি ভালবেসেছিলাম, এ জীবনের সবকিছুর চেয়েও। মানুষ নিজেকেও ততটা ভালবাসে না, যতটা আমি ভালবেসেছিলাম তোমায়। কিন্তু তার বদলে আমি পেয়েছি শুধু তোমার অনাদর, অবহেলা আর তাচ্ছিল্য। আমার মন তোমার কাছে একটা খেলার জিনিস, আমার প্রেম তোমার কাছে একটা

পরিহাস, আমি তোমার কাছে একটা ক্লাউন ছাড়া আর কিছু নই। আজ সেই ক্লাউনের পরম-চরম তামাশা তোমায় দেখাব।

পাশের ঝাঁপি খুলে সাপটাকে বার করে আমি বলি—"এটা হচ্ছে রাজ-গোখুরো সাপ। সচরাচর বড় পাওয়া যায় না লোকালয়ে। অনেক সন্ধান করে একজন পাহাড়ি সাপুড়ের কাছ থেকে জোগাড় করেছি এটা।"

সাপের মুখটা বুকের কাছে তুলে ধরলাম আমি। ফণা তুলে তক্ষুণি ছোবল মারল সেই ভয়ঙ্কর কালনাগ। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে অনীতা। চিৎকার করে সে বলল—"একি, একি করলেন আপনি।"

—"এই তো আমার তামাশা," সাপটাকে ঝাঁপির মধ্যে বন্ধ করে আমি বললাম।

"এবার দেখো কেমন করে মরণ ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে আমার দিকে আর জীবন ধীরে ধীরে চলে যায়; কেমন করে এই গরম তাজা দেহটা হয়ে যায় বরফের মতো ঠাণ্ডা। কেমন করে নিঃস্তব্ধ হয়ে যায় হৃদয়ের গতি। ভাবি মজার খেলা এটা—নয় কি? বিহ্বল দৃষ্টিতে এতক্ষণ আমার মুখের পানে তাকিয়েছিল অনীতা। নিঃশব্দে শুনছিল সে আমার কথা। টেলিফোনটা নজরে পড়তে সে হঠাৎ ছুটে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নেয়।

—"কাকে ফোন করছ আবার?" আমি জিজ্ঞেস করি।

—"ডাক্তারকে।"

—"এ রাজ গোখুরো সাপ হলো মরণের দূত, যার হাত থেকে বাঁচান ডাক্তারের তো সাধ্যাতীত, বোধহয় ভগবানেরও অসাধ্য। কি লাভ এই শেষ সময়ে চিকিৎসা সঙ্কটের প্রহসনে?'

—"লাভ আপনার না থাকুক, আমার আছে। আপনার জন্য না হোক আমার জন্যে। ফোন করে আমার পাশে এসে দাঁড়ায় অনীতা।—"তুমি কি জান?" স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে সে বলে, "তুমি একটা পয়লা নম্বরের ইডিয়ট।"

—"অকপটেই মেনে নিচ্ছি আমি তোমার এই সবিশেষ বিশেষণ।"

—"চোখ থাকতে তুমি অন্ধ। এতদিনেও চিনতে পারলে না আমায়? এ জীবনের সার্কাসে যদি তোমায় ক্লাউন না পেলাম তবে কি রইল আর আমার জীবনে? তোমায় ছেড়ে আর কিসের তরে আমার বাঁচা? তুমি ভেবেছ বুঝি তুমিই জিতে গেলে আজকের এই খেলায়? সেটা তোমার ভুল। এ খেলার শেষ বাজী এখনও বাকি। সেটাই এখন দেখ।"

ঝাঁপি খুলে খপ করে সাপটাকে নিজের হাতে তুলে নেয় অনীতা। তারপর নিজের চেটোটাকে এগিয়ে নেয় তার মুখের সামনে। এবারও দংশন করতে বিরত হয় না সেই ভুজঙ্গম।

খানিকক্ষণ পরে দরজার কড়া নাড়ার আওয়াজ হয়। ঘরে ঢোকেন ডাক্তার।

—"কাকে সাপে কামড়েছে?"—জিজ্ঞেস করেন ডাক্তার।

অনীতা আমায় দেখিয়ে দেয় কোন কিছু বলার আগে।

—"কোথায় কামড়েছে সাপ?"

—"বুকে।"

—"কি সাপ?"

"রাজ গোখুরো?"

"কতক্ষণ আগে কামড়েছে?"

"তা প্রায় ঘণ্টা খানেক হলো।"

"রাজ গোখুরো সাপ কামড়েছে ঘণ্টা খানেক আগে আপনার বুকে আর আপনি এখনও জলজ্যান্ত বেঁচে আছেন? দেখি কোথায় আপনাকে কামড়েছে সাপটা?"

—"কৈ, বিষদাঁতের তো কোন চিহ্নই দেখতে পাচ্ছি না আমি, "ক্ষতস্থানটা পরীক্ষা করে ডাক্তার বলেন, "কি করে সাপটা এলো এখানে?"

—"একজন সাপুড়ের কাছ থেকে কিনেছিলাম আমি এটা।"

—"ওঃ, তাই! সাপুড়েরা প্রায়ই সাপের বিষদাঁত ভেঙে দেয়। ওষুধপত্রের কোন দরকার নেই। বিষ আপনার শরীরে যায় নি। আর যদি সত্যিই যেতো, কোন ওষুধই কিছু করতে পারত না।"

গল্পটা শেষ করে রমেশ থামল।

—"তারপর?" আকুল আগ্রহে প্রশ্ন করলাম আমরা।

—"তারপর কাল আমাদের বিয়ে। তোমাদের সকলকে আসতে হবে সন্ধ্যায় টি পার্টিতে।"

—"কিন্তু একটা কথা বলতে তুমি ভুলে গেছ রমেশ," আমি বলি, —"বিষদাঁত ভাঙা দেখেই সাপটা কিনেছিলে তুমি।"

স্বয়ম্বরা

টেলিফোনের বিসিভারটা তুলে নিয়ে আমি ডায়াল করলাম 24-2561-কে।

কিছুক্ষণ পরে নারী কণ্ঠে জবাব এলো- "Hallow ?"

—"এটা কি 24-2561 ?"

—"না, এ হোল 24-2551।"

—"Wrong Number। মাপ করবেন"

—"উঁহুঁ, অত সহজে মাপ করতে আমি রাজা নই"

—"তাহলে সাজা দিন আমায়। আমি তৈরী।"

—"আমার একা একা মোটেই ভাললাগছেনা আজ রাতে সুতরাং এখন আমার সঙ্গে গল্প করতে হবে আপনাকে।

—"কিসের গল্প ?"

—"যা আপনার খুশী।"

—"মুশকিলে ফেললেন দেখছি আমায়। ইচ্ছে করলেই তো আর গল্প তৈরী করা যায় না। আমি তো আর গল্প লেখক নই। আচ্ছা আর একদিন আপনাকে গল্প শোনাবার কথা দিচ্ছি আমি।"

—"ধন্যবাদ। আজ তাহলে কি করা যায়"

—"আজ হোক আমাদের পরিচয়। বলুন কি আপনার নাম ?"

—"যে নামে আমায় ডাকবেন, তাই আমার নাম।"

—"তোমায় আমি ডাকব 'বাণী' বলে, কারণ বাণীর মধ্য দিয়ে খুঁজে পেয়েছি তোমাকে।"

—"আর আপনার নাম ?"

—"সেটা ঠিক করবার ভার তোমার ওপর।"

—"আপনার নাম আমি রাখলাম 'অরূপ কুমার', কারণ আপনাকে তো আর দেখতে পাচ্ছি না চোখের সামনে।"

—"জানতে পারি তোমার নিবাস কোথায়?"

—"নিশ্চয়ই। নিবাস আমার অচিনপুর। আচ্ছা, আপনার চেহারা বুঝি খুব ভাল—না?

—"কি করে বুঝলে?"

—"আপনার গলা শুনে।"

—"আমাদের পাড়ায় একটি লোক থাকে। তার গলার আওয়াজ ভারি চমৎকার। রেডিওতে গান দেয় সে! কিন্তু যদি একবার তাকে দেখো, তো দ্বিতীয় বার দেখতে ইচ্ছে করবে না।"

—"আমার চেহারা কেমন জানতে ইচ্ছে হয় না?"

—'ইচ্ছে হলেও জানবার তো উপায় নেই। তোমায় জানিনা বলেই তুমি আজ থেকে হলে আমার কল্পলোকের রাণী—তোমায় ইচ্ছেমতো গড়ব আমি নিজের কল্পনা দিয়ে। এই যে অজানার রহস্য, এতে এত বেদনা আছে বলেই বোধহয় এত মধুর। দেখ কত কাছে তুমি আমার অথচ কত দূরে। তোমার গলার রেশ কানে আসছে, এত ঘনিষ্ঠ ভাবে তোমার সঙ্গে আলাপ করছি, তবু না পারছি তোমায় দেখতে, না জানছি তোমার পরিচয়। আমার কাছে তুমি এক মধুর রাগিনীর মতো, এক সুন্দর স্বপ্নের মতো—যাকে উপলব্ধি করা যায়, তবু পরশ যার কখনও মেলে না।"

—"আমার মন এত কাল্পনিক নয়, কবি মশাই। বলি আপনার করা হয় কি?"

—"দশটা পাঁচটা।"

—"বিয়ে থা হয়েছে?"

—"না।"

—"কেন?"

—"জোটেনি বলে।"

—"কখনও প্রেমে পড়েছেন ?"

—"হাঁ, আজই পড়লাম।"

—"কার সঙ্গে ?"

—"তোমার সঙ্গে।"

—"ধেৎ।"

টেলিফোনের রিসিভারটা রেখে দিল সে।

এই হলো আমাদের আলাপের শুরু, কিন্তু এতেই তার সাঙ্গ নয়। কথা আমাদের চলতো দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, যদিও না আমি জানতাম ওকে, না ও চিনত আমায়। আমরা হয়ে উঠেছিলাম দুই অন্তরঙ্গ সাথী। দুজনে দুজনের মনের কথা খুলে বলতাম দুজনকে. যদিও না ও দেখেছে আমার চেহারা, না আমি দেখছি ওর রূপ।

একদিন মেঘে ঢাকা আকাশ ছিল নিকষ কালো, অঝোরে ঝরে পড়ছিল বৃষ্টি। হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল ক্রিং ক্রিং করে।

রিসিভারটা তুলে নিয়ে আমি বললাম—"Hallow ?"

উত্তর এলো—"কে, অরূপ কুমার নাকি ?"

—"হাঁ বাণী, ঠিকই ধরেছ। তারপর এত রাত্রে যে তলব দিলে —কি ব্যাপার ?"

—"বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশ অন্ধকার। মনটা উদাস লাগছিল—তাই তোমায় ফোন করলাম।"

—"ভালই করেছ, নইলে আমাকেই হয়ত ফোন করতে হোত আজ "

—"মনে পড়ে যেদিন প্রথম আমাদের পরিচয় হয়, তুমি বলেছিলে আমায় গল্প শোনাবে। কয়েক মাস তো কেটে গেছে—আজও তৈরী হোল না তোমার সে গল্প ?"

—"নতুন করে আর কি গল্প বলব ? আমাদের এই আলাপই তো একটা গল্প। তবে এর লেখক আমিও নই, তুমিও নও। লেখক সেই, যে আড়ালে বসে নাড়ছে সকলের জীবনের কলকাঠি।"

—"তা এ গল্পের শেষে কি আছে—Tragedy না Comedy ?"

—"গল্প লেখকই শুধু একথার জবাব দিতে পারেন। একটা কথা বলব—শুনবে ?"

—"বল !"

—"তোমায় কখনও দেখিনি আমি, জানিনা কি তোমার রূপ, কতখানি নীল তোমার চোখ আর কেমনতর গোলাপী তোমার অধর। শুধু জানি তুমি একটা মায়ার মতন, যাকে ধরা যায় না, ছোওয়া যায় না, যে কাছে এসেও থাকে সব নাগালের বাইরে। কিন্তু এ ফাঁকা যাদুতে আর মন ভরছে না। আজ এই বর্ষণ মুখরিত ঝড়ের রাতে শূন্য মন আমার হাহাকার করে উঠছে শুধু তোমার জন্য। মনে হচ্ছে তুমিই আমার সবচেয়ে আপন, তুমি ছাড়া আমার এ জীবনে আর কিছু নেই। বলো, আজ শেষবারের মতো বলে দাও, আমার আশা কি এ জীবনে আর মিটবে না ? তোমায় পাবনা কি আমি কোনদিনই ?"

—"ধরা দেব যদি খুঁজে নাও আমায়।"

—"কোথায় ?"

—"আমার স্বয়ম্বর সভায়। ঠিক করেছি আমি করব আমার স্বয়ম্বরা।"

—"স্বয়ম্বরার কি দরকার, যখন আমি স্বয়ম্ বর হতে রাজী আছি।"

—"উঁহুঁ অত সহজে আমায় তুমি পাবে না। আমায় জয় করে নিতে হবে তোমাকে।"

—"কি করে ? সৈন্যসামন্ত দিয়ে যুদ্ধ করে, না ঘোড়ায় চড়ে হরণ করে ?"

—"ওসব এ যুগে এখন অচল হয়ে গেছে। এ হোল বুদ্ধির যুগ। এখন বুদ্ধির জয়ই হোল আসল জয়।"

—"তাহলে কি করতে হবে আমায় ?"

—"কাল সন্ধ্যা ছ'টার সময় আমি ভিকটোবিয়া মেমোবিয়াল বাগানে থাকব বসে তোমার প্রতীক্ষায়। যদি আমায় চিনে নিতে পাব তুমি, তো তোমার গলায় পরিয়ে দেব আমি জয়মাল্য।

—"আর যদি তা না পারি?"

—"তাহলে, The case will remain under consideration.

টেলিফোনের সংযোগ ছিন্ন হোল।

পরের দিন সন্ধ্যা ছ'টা বাজতে না বাজতেই হাজির হলাম আমি ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালে। পশ্চিমের আকাশ লাল করে সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছিল। প্রতিফলনে পুকুরের পাড় হতে বেরুচ্ছিল একটা রক্তিম আভা। কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে দেখাব ফুরসুৎ আমার ছিল না। তাকেই খুঁজছিলাম, যাকে খুঁজতে এসেছিলাম আমি।

কোথাও কোন বেঞ্চ খালি ছিল না। পার্কে বসেছে যেন এক নরনারীর মেলা— যেমন রোজ বসে এখানে। কিন্তু হায়, তার মধ্যে কোথায় আমার মানস প্রিয়া—কোথায় লুকিয়ে আছে আমাব অচেনা 'বাণী'?

পার্কের নিজন দিকটায় বসে ছিল একটি মেয়ে। চোখে তাব Sunglass. হাতে একটা ফুলের মালা। গিয়ে তার পাশে বসলাম আমি। বললাম—"Hallow 242551?"

মেয়েটি চমকে উঠল। তারপর হেসে আমায় জিজ্ঞেস করল— "আমায় চিনলে কি করে তুমি?"

—"আমার কথার জবাব শুনে।"

—"আর যদি সত্যি আমি সে না হতাম?"

—"তো আর একজনকে না হয় জিজ্ঞেস করতাম একথা, যদিও আমি ভাল করেই জানতাম যে তুমিই সেই। তোমার অতি সাবধানতাই ধরিয়ে দিয়েছে তোমায়। সাধারণ লোকে তুপুব বেলায়

Sunglass পরে। অতি সাবধানীরাই সন্ধ্যা বেলায় Sunglass পরে অপরের চোখ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখার জন্যে। কিন্তু একচক্ষু হরিণের মতো তারাই পড়ে ধরা। তাছাড়া তোমার হাতে আছে এই ফুলের মালা। আমি জানতাম ফুলের মালা সঙ্গে নিয়ে আসবে তুমি—আসবে এ গলায় পরিয়ে দেবার জন্যে।"

মৃদু হেসে মেয়েটি আমার গলায় পরিয়ে দিল ফুলের মালা।

ইজ্জৎ

লুপ লাইনে হাওড়া—বারাউনি প্যাসেঞ্জার ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে চলে। এই গাড়িতেই চড়েছিলাম আর আমার পাশে বসেছিলেন শীর্ণকায় আধবুড়ো একজন ভদ্রলোক। গলায় তাঁর কণ্ঠির মালা, কপালে তিলক। একটা শাদা পাঞ্জাবী তাঁর গায়ে আর পরনে ধুতি, পায়ে এক জোড়া পুরনো চপ্পল।

গাড়ি তখন ঘন আম কাঁঠালের বন পার হচ্ছিল। মাঝে মাঝে ছাড়া ছাড়া দু'চারটে মাটির ঘর আর কোথাও কিছু খোলা জমি। সূর্য তখন পাটে বসেছেন—আকাশের গায়ে আবির ছড়ান।

আমার পাশের ভদ্রলোকটি বললেন,—"গাড়ি তো দেখছি দু'ঘণ্টার ওপর লেট। ভেবেছিলাম সন্ধ্যার মধ্যেই ভাগলপুরে পৌঁছে যাব। সেখানে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে দেখা না করলে আমার কাজই হবে না। আজকাল সাহেব সুবার সঙ্গে ডেট মুলাকাৎ না করলে সব কাজই হয়ে যায়, ইতো নষ্টঃ, স্তথো ভ্রষ্টঃ। আর সন্ধ্যার পরেই ম্যাজিষ্টেট্ সাহেব ক্লাবে বেরিয়ে যান—তখন আর দেখা হয় না। আজকের রাতটা ওখানেই থাকতে হবে দেখছি। নইলে ঘণ্টা খানেকের মতো কাজ ছিল—কাজ সেরেই অন্য ট্রেনে পাড়ি দিতাম।"

ভদ্রলোক পোঁটলা থেকে একটা গাঁজার কল্‌কে বার করলেন। তাতে গাঁজা ভরে, আগুন জেলে, "জয় মাধব" বলে বার কয়েক মোক্ষম টান দিলেন। তারপর শিবনেত্র হয়ে তুরিয়ানন্দে একটা গল্প ফাঁদলেন। তখন গাড়ির একটানা ঝাঁকুনিতে আমার ঢুলুনি এসেছিল। ভদ্রলোকের গল্পের কিছুটা কানে গেল, কিছুটা গেল না। গল্পটার সত্যমিথ্যা জানি না, তবে সেই গাঁজায় দম দেওয়া গল্প যেটুকু

আবছা মনে পড়ে, তা অনেকটা এই রকম—'কথায় বলে মাছের সেরা ইলিশ, আর মানুষের সেরা পুলিশ, ইংরাজের আমলেই বাঘে গরুতে জল খাওয়াত। স্বাধীনতা লাভের পর, পুলিশের প্রতাপ আরও বেড়ে গেছে খানিকটা। স্বাধীন ভারতের পুলিশ জল খাওয়ায় না, খাওয়ায় ঘোল। বাঘ গরুকে নয়, মানুষকে।

মালপত্র এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ট্রাকে করে পৌঁছে দেবার কাজকে আমাদের প্রদেশীয় গভর্নমেণ্ট Public utility service বা জনসেবার মর্যাদা দান করেছেন। আর সেই সঙ্গে আইনের হাজারো শৃঙ্খলে বেঁধে দিয়েছেন এ ব্যবসা আষ্টেপৃষ্ঠে। গাড়ির কলকব্জাগুলো যেন হামেশা ঠিক থাকে, ড্রাইভারের লাইসেন্স যেন হামেসাই মজুত থাকে, মালপত্রের ওজন যেন কোনক্রমেই নির্দ্ধারিত মাত্রা না ছাড়িয়ে যায়—এই ধরনের হাজারো আইন আর কানুন। বলা বাহুল্য যেখানে আইন, সেখানেই আছে বে-আইন, যেখানে নিয়ম, সেখানেই আছে অ-নিয়ম, যেখানে যত বজ্র আঁটুনি সেখানে ততোধিক ফস্কা গেরো। আর এসব ব্যাপারে কিছু তুর্নীতি পরায়ণ পুলিশ অফিসারের যে পোয়াবারো, তার সন্দেহ নেই।

মাসখানেক আগে খবর পেলাম, যে আমাদের এলাকায় নাকি বহাল হয়ে এসেছেন এক কড়া ধরনের খামখেয়ালী আর বদমেজাজী ইনস্পেকটার। নাম তাঁর চতুরানন চৌধুরী। ঠিক সময়ে ঠিক মতো প্রণামী না পেলে, এ দেবতা নাকি মহেশ্বরের মতো সংহার মূর্তি ধারণ করেন, ফাউণ্টেন পেনের ত্রিশূল বাগিয়ে।

সাইকেল করে যাচ্ছিলাম একদিন। দেখি একটা জীপ গাড়িতে ইনস্পেকটার চতুরানন বাবু চলেছেন কয়েকজন পুলিশ সমভিব্যা-গারে, বোধহয় কোন শিকারের সন্ধানে। চতুরানন নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। চকচকে তাঁর চোখ তুটো জ্বলছিল, শিকারী বেড়ালের

মতো। হেলে পড়া ক্রীপহীন টাইটা পতাকার মতো পত্ পত্ করছিল চলন্ত গাড়ির জোরালো হাওয়ায়।

ঠিক সেই সময়ে, উলটো দিক থেকে সেখানে আসছিল ছুটে একটা ট্রাক, অগ্নির মুখে পতঙ্গের মতো। দি ন্যাশনাল অয়েল মিল্সের নিজস্ব ট্রাক সেটা। দি ন্যাশনাল অয়েল মিল্স্ এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় তেলের কল। এর মালিক শেঠ বুলাকিদাস তেলের কারবার করে লক্ষপতি থেকে বহু লক্ষপতি হয়েছেন। ট্রাকটার কেরিয়ার সর্ষের তেলে বোঝাই করা। দেখলেই মনে হয়, নির্দ্ধারিত ওজনের অন্ততঃ ডবল মাল আছে তার গর্ভে।

আনন্দে উদভাসিত হয়ে উঠল চতুরাননের সুচতুর আনন। পকেট থেকে হুইসল্টা বার করে তাতে দিলেন একটা সজোরে ফুঁ। তারপর মুখ বাড়িয়ে, তুলে ধরলেন নিজের ডানহাতটা।

ট্রাক থেমে গেল। বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে নেমে এল ড্রাইভার।

—"তোমার লাইসেন্স আর রেজিষ্ট্রেশানের সার্টিফিকেটটা দেখি।"

—"এই নিন হুজুর, –" ড্রাইভার এগিয়ে দেয় কতকগুলো ময়লা চিটে ধরা কাগজ।

—"হুঁ, তোমার ট্রাকটা বড় বেশী বোঝাই করা মনে হচ্ছে।"

—"না হুজুর, এতটুকুও বেশী মাল নেই এতে—বিশ্বাস করুণ।"

—"সেটাই যেচে দেখতে চাই একবার। নিয়ে চল ট্রাকটা থানায়।

"আমার কথায় বিশ্বাস করুন হুজুর? আমার কসম্, আমার বাপের কসম্, আমার "

—"আহাহা সকাল সকাল অতগুলো দিব্যি গেল না: ইনস্পেকটার সাহেব থামিয়ে দেন তাকে,—"তোমাদের কথায় বিশ্বাস? দশ বছর পুলিশে কাজ করছি আমি।"

অধোবদনে দাঁড়িয়ে থাকে ড্রাইভার। না জানি, আজ কার মুখ দেখে বেরিয়েছিল সে ট্রাক নিয়ে।

"আজকাল বাজারে খাঁটি সর্ষের তেল আর খাঁটি দুধ মেলা বড় মুস্কিল—না ?" কথাটার মোড় ঘুরিয়ে নেন ইনস্পেকটার সাহেব।

—"কত খাঁটি সর্ষের তেল চান হুজুর ? আমি পৌঁছে দিচ্ছি আপনার বাড়ীতে—এখুনি, এই মুহূর্তে।"

—"থাম, থাম, অত ব্যস্ত হয়ো না," আশ্বস্ত করেন ইনস্পেকটার সাহেব ড্রাইভারকে,—"আমার ছোট সংসার, তা চার সের তেলেই চলে যাবে আমার একমাস।"

—"চার সের কেন, দশ সের তেল নিয়ে আমি হাজির করছি, একবার হুকুম পেলেই।"

—"মিছি মিছি নষ্ট হবে। হাঁ, কি যেন বলছিলাম তখন ? খাঁটি দুধের কথা—না ? খঁটি দুধের জন্য একটা গরু রেখেছি আমি বাড়ীতে। হিন্দু শাস্ত্রে বলে গো-ব্রাহ্মণ সেবায় নাকি অশেষ পুণ্য—নয় কি ?"

নীরবে মাথা নাড়ে ড্রাইভার। সাত-পাঁচ ভেবে কিছু ঠাহর করতে পারেনা বেচারা।

—"তা গরু রাখলেই তো আর ভাল দুধ পাওয়া যায় না। ভাল দুধের জন্য গরুকে ভাল করে খাওয়ান দরকার। শুনেছি, সর্ষের খোল দিলে গরুর দুধ নাকি ভাল হয়। তা একটা গরুর একমাসের খোরাকের জন্যে চার মন খোলই যথেষ্ট—কি বল ?"

"এ আর বেশী কথা কি হুজুর ? আজ এখনি আপনার বাড়ীতে গিয়ে রেখে আসছি সর্ষের তেলের একটা চার সেরী টিন আর চার মণ খোল।"—হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচে ড্রাইভার।

—"হুঁ; এই নাও তোমার লাইসেন্সের কাগজপত্র। যত্ন করে রেখো—বড় ময়লা হয়ে গেছে এগুলো।"

—"আপনার অসীম দয়া। আপনার ভরসাতেই তো হুজুর

আমাদের কারবার চলছে।”—গদগদ বিনয়ে একেবারে লুটিয়ে পড়ে ড্রাইভার।

সত্যি, যত দেখছি, ততই আশ্চর্য্য লাগে আমার চতুরানন চৌধুরীকে। শেঠ বুলাকীদাসের মতো মালদার শিকারকে ফাঁসিয়ে শেষে কিনা এই যৎকিঞ্চিৎ অকিঞ্চিৎ কর দাবী।

—“হুঁ, একটা কথা,” জীপেতে ষ্টার্ট দিয়ে চতুরানন বলেন ড্রাইভারকে, “সর্ষের তেল আর খোল শুধু এ মাসেই নয়, মাসে মাসেই পাঠিয়ে দিও ওটা। খাঁটি সর্ষের তেল আর দুধ তো শুধু একমাস খেলেই হয় না—সব মাসেই খাওয়া উচিত।”

চমকে ওঠে ড্রাইভার চতুরাননের কথা শুনে। ব্যাপারটা এতক্ষণে সে যেন বুঝতে পারে তলিয়ে। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলে—“সে আপনি ভাববেন না হুজুর—আমি নিজে ভার নিচ্ছি সব কিছুর।”

এর পরের ঘটনার সঙ্গে আমার কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নেই। পুলিশ আফিসে আমার এক আলাপী কেরানীর কাছে যে গল্প আমি শুনেছি, তারই সারাংশ বিবৃত করছি—

সেইদিনই ড্রাইভার পৌঁছে দিয়ে গেল চার সের তেলের টিন আর চার মণ খোল। তার পরের মাসে ঠিক যথা সময়ে এসে পৌঁছুল তেল আর খোল, এমনকি তার পরের মাসেও। চতুর্থ মাসে বরাদ্দের আশায় যখন দিন দশেক কাবার হয়ে গেল, তখন বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লেন চতুরানন। বুলাকীদাস তাঁকে ভুলে গেল নাকি? যে কাজের সময় হয় কাজী, কাজ ফুরুলে সে কি সত্যিই হয়ে পড়ে পাজী? আকুল আগ্রহে কেটে গেল আরও সাতটা দিন। তখন চতুরানন জমাদার ছেদীলালকে পাঠালেন বুলাকীদাসের কার্যালয়ে।

ছেদীলাল চতুর লোক। ফন্দীফিকির করে ঢুকে পড়ল সে খোদ্ কর্তার খাস্ কামরায়।

—"আমি হুজুর ছেদীলাল," একটা সেলাম ঠুকে সে বললে, "ইনস্পেকটার চতুরানন বাবুর কাছ থেকে আমি এসেছি।"

—"কি চাও তুমি এখানে?" --গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন শেঠ বুলাকীদাস।

—"হুজুর, এ মাসের তেল আর খোলটা এখনও এসে পৌছায় নি।"—কথাটা সোজাসুজি পাড়ল সে।

—"তেল আর খোল?" আকাশ থেকে পড়েন যেন শেঠজী,—"কি বলছ তুমি বুঝতে পারছি না।"

—"চার সের তেল আর চার মণ খোল হুজুর প্রতিমাসে পাঠিয়ে দেন কিনা ইনস্পেকটার সাহেবকে।"

—"চার সের তেল আর চার মণ খোল পাঠাতে যাব আমি কোথাকার কে এক ইনস্পেকটারকে?" আগুন হয়ে ওঠেন বুলাকীজী। তারপর একটু থেমে প্রশ্ন করেন,—"ইনস্পেকটার সাহেবের নিজের লেখা খত আছে তোমার কাছে?"

—"না হুজুর।"

—"তোমার মুনিবকে বলো, আমাদের তেলের টিন সব মুদির দোকানে কিনতে পাওয়া যায় চোদ্দ টাকা কিলো দরে। আর সর্ষের খোল? তার খবর আমার চেয়ে গয়লারা ভাল করে বলতে পারবে।"

—"যে আজ্ঞা হুজুর।"

ফিরে এসে ছেদীলাল পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিবৃত করল সব কথা যথাযথ পরম্পরায়। শুনে শুধু নিস্ফল আক্রোশে ফুলতে থাকেন চতুরানন, শিকারচ্যুত ব্যাঘ্রের মতো।

এর কিছুদিন পরেই মাছি এসে পড়ল জালে। থানা থেকে সবে বাড়ী ফিরেছেন চতুরানন বাবু। বাইরের বারান্দায় বসে একটু

জিরিয়ে নিচ্ছিলেন তিনি। বদনে তাঁর অর্দ্ধদগ্ধ সিগ্রেট, পরনে ঘর্ম-লিপ্ত য়ুনিফর্ম। এমন সময় এক পাবলিক ট্রাক পূর্ণ বেগে এসে পড়ল সামনের রাস্তায়—তেলের টিনে মাত্রাধিক বোঝাই তার গর্ভ।

ট্রাকটা শেঠজীর নয় তো? সচকিত হয়ে ওঠেন ইনস্পেকটার। হাঁ, তাইত বটে। মাথার উপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা—'দি ন্যাশানাল অয়েল মিলস্'—সিলভার পেইন্টে। তড়াক করে চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে ওঠেন তিনি। পড়ি কি মরি করে ছুটে গেলেন রাস্তায়—তারপর পকেট থেকে বার করে সজোরে বাজিয়ে দিলেন তাঁর হুইশ্ল্। ট্রাক থামিয়ে নেমে আসে ড্রাইভার। একই কথার পুনরাবৃত্তি করে সে একই ভঙ্গিতে, সবিনয়ে আর সসঙ্কোচে—

—"এবারকার মতো ছেড়ে দিন হুজুর। আর কখনও—"

—"কোন কথা আমি শুনতে চাই না! ট্রাক এখুনি নিয়ে যাও থানায়। একটু পরেই আসছি আমি সেখানে।"—মুখ ফিরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন ইনস্পেকটার সাহেব ড্রাইভারের জবাবের প্রত্যাশা না করেই।

ট্রাকটা থানায় পৌঁছে দিয়েই ড্রাইভার চোঁ চোঁ চম্পট দিলে শেঠজীর অফিসে। ঠিক ওই দিনই আমায় যেতে হয়েছিল থানায় একটা বৈষয়িক বিষয়ের ব্যাপদেশে। চতুরানন বাবুর সঙ্গে আমার কথাবার্তা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় ঘরে ঢুকলেন শেঠ বুলাকীদাস স্বয়ং।

—"আসুন, আসুন, শেঠজী," চতুরানন সাদরে অভ্যর্থনা জানান, —"আজ আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনার মতো বড়লোকের পায়ের ধূলো পড়ল আমার মত সামান্য লোকের অফিস রুমে।"

"আপনি আমায় চেনেন দেখছি," চেয়ারে নিজের বিশাল দেহভার রক্ষা করে বলেন শেঠজী।

—"আপনাকে কে-না চেনে? তেলের কারবার করে কত টাকা যে জমিয়েছেন, তার কি কোন ইয়ত্তা আছে?"

—"হুঁ," বেশ শক্ত পাল্লায় পড়েছেন, ভাবেন শেঠজী।

—"তারপর, এককাপ চা ইচ্ছা করেন ?" কথাটার মোড় ঘুরিয়ে নেন চতুরানন বাবু।

—"চা আমি খাইনা।"

—"তবে অন্ততঃ এক গ্লাস শরবতই হোক। এই ছেদীলাল, ভাল দেখে তিন গ্লাস বাদামের শরবৎ নিয়ে এসো তো বাজার থেকে।"

ছেদীলাল প্রস্থান করলে বুলাকীদাস পাড়েন কথাটা সন্তর্পণে।

—"শুনলাম, আমাদের একটা ট্রাক নাকি আটক করে রাখা হয়েছে থানায় ?"

—"আজ্ঞে হাঁ, কথাটা ঠিকই শুনেছেন। ট্রাকটাকে আটক করে রাখা হয়েছে ওভার লোডিং-এর সন্দেহে। তা সেজন্য আপনি ব্যস্ত হবেন না শেঠজী।"

—"সেই জন্যেই তো আমার এখানে আসা।"

—"ও, তাই নাকি ? তা আপনি কিছু ঘাবড়াবেন না শেঠজী। যখন আপনি এতদূর এসেছেন কষ্ট করে, তখন আমি কি আর আপনার কাজ না করে বসে থাকতে পারি, এখুনি যাচ্ছি, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ওজন করাচ্ছি আপনার ট্রাকের জিনিষপত্র, তারপর ট্রাকের কল্‌কব্‌জাগুলো দেখে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে একটা রিপোর্ট লিখেই খালাস করে দিচ্ছি আপনার ট্রাক। ঘণ্টাখানেকের বেশী দেরী লাগবে না—বড় জোড় দেড় ঘণ্টা।"

"এবারকার মতো মাপ করে দিন ইনস্পেকটার সাহেব। কত টাকা আপনার চাই, বলুন ?"

—"টাকা ?" চোখ দুটো কপালে তুলে ইনস্পেকটার বলেন, "কিসের টাকা ?"

—"আজ্ঞে—মানে, মানে," ঠিক জুতসই কথা খুঁজে পান না বুলাকীজী, "আজ্ঞে ফাইনের টাকা আর কি।"

—"ফাইনের টাকা এখানে দিতে হয় না—সে টাকা দেবেন ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারের পর।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন বুলাকীদাস। সোজা এগিয়ে যান তিনি চতুরানন বাবুব দিকে—গিয়ে ধপ্ করে বসে পড়েন তিনি মেঝের উপর, ঠিক ইনস্পেকটার সাহেবের পায়ের কাছে। তারপব হাত বাড়িয়ে পা তুটো জড়িয়ে বলেন, "একবাব শুধু দয়া করুন হুজুর —যত টাকা লাগে আমি দিয়ে দিচ্ছি।" কণ্ঠ তাঁর বাষ্পরুদ্ধ, তুচোখে তু ফোঁটা উদ্গত অশ্রু !

পুলিশ ! কলিযুগের কল্কি অবতার তুমি ! লক্ষপতি বুলাকী-দাসও কল্কে পায় না তোমার কাছে।

"আ-হা-হা করেন কি আপনি ?" বুলাকীদাসকে হাত ধরে ওঠান ইনস্পেকটার সাহেব,—"বসুন, বসুন এই চেয়ারে। অধীর হয়ে কোন লাভ নেই।"

—"ছেদীলাল ইতিমধ্যে শরবৎ দিয়ে গেল টেবিলে। বুলাকী-দাসের দিকে চতুবানন একটা গেলাস বাড়িয়ে দিয়ে বলেন—"নিন, খান এই শরবৎ। মন ঠাণ্ডা হয়ে যাবে এতে।" তারপব একটা গ্লাস তুলে নেন নিজে।

—"প্রায় মাস চারেক হলো আপনাব একটা ট্রাক, আমাদেব হাতে ধরা পড়েছিল—না ?"

—"আজ্ঞে হাঁ" –আমতা আমতা করে জবাব দেন শেঠজী।

—"ঠকঠকে চার টিন তেল আর কিছু খোল পাঠিয়ে আপনি ভাবলেন বুঝি খুব ফাঁকি দিলাম উজবুক ইনস্পেকটাবকে। কিন্তু সেদিন বোধহয় আপনার মনে ছিল না, যে এক মাঘে কখনও শীত পালায না। সেদিন বোধহয় আপনি ভুলেই গিয়েছিলেন যে আপনার ট্রাক-গুলো চলবে আসমানের উপব দিয়ে নয়, এই মাটির সড়ক আর জমি দিয়ে, যেখানে আপনার সঙ্গে পুলিশেব সম্বন্ধ জলেব সঙ্গে মাছেব সম্পর্কের মতোই ঘনিষ্ঠ। টাকার কথা কি বলছেন আপনি ? লক্ষ

টাকা পেলেও খালাস করব না আপনার ট্রাক। ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে আপনাব কেস্ চালান করে, তবে অন্য কাজ।"

গ্লাশের শরবৎ শেষ না করেই উঠে পড়েন শেঠজী। আপনাদেরও একটা সীমা আছে, শ্লেষেরও আছে একটা শেষ। বেড়ালও বোধহয় এমন করে খেলায় না তার কুক্ষিগত ইঁদুর ছানাকে।

শেঠজী চলে গেলে, আমি চতুরাননকে বললাম—"দাঁওটা ছেড়ে ভাল করলেন না। জুৎসই মোচড় দিলে বেশ কিছু আদায় করা যেতে পারত। বুলাকীদাস মালদার লোক।"

একটা সিগ্রেট ধরিয়ে চতুরানন এলিয়ে দেন নিজেকে চেয়ারের উপর। তারপর একমুখ ধোঁওয়া ছেড়ে তিনি বললেন,—"টাকাটাই সবকিছু নয় রামচন্দর বাবু। পুলিশে কাজ করি, ঘুস নিই বটে, তবু আমার একটা ইজ্জৎ আছে।"

পরে শুনেছিলাম যে এই ইনস্পেকটার ঘুষ নেবাব চার্জে সাস্পেণ্ড হয়ে গেছেন। এব পেছনে শেঠ বুলাকীদাসেব হাত ছিল কিনা; কে জানে?

খেলোয়াড

মদের দোকানে আলাপ হলো মনিরামের সঙ্গে। মাথার উপর ফ্যানটা ঘুরছিল বন্ বন্ করে আর তার ছায়াটা দুলছিল সামনের প্লাসটার খসা দেওয়ালে। দূরে জানলা দিয়ে পোর্ট কমিশনারের ইয়ার্ডটা দেখা যায়। একটা জাহাজ পেট ফুলিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছিল —বোধহয় বিদায়ের ঘণ্টা পড়েছে। সামনের রাস্তা দিয়ে একরাশ ধুলো আর শুকনো পাতা উড়িয়ে একটা দমকা হাওয়া দোল দিয়ে চলে গেল। ছেড়া সস্তা পর্দাটা টান হয়ে খুলে গেল হাওয়ার দোলায়।

মদেতে চুমুক দিয়ে মনিরাম বললে, —বাবু এমনিই একদিন একটা লোক বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে বসেছিল, যেখানে আপনি বসে আছেন সেই চেয়ারে। সে মদ খাবার পর, বিল নিয়ে এল বেয়ারা। সে পকেটে একবার হাত ঢুকিয়ে, জুল্ জুল্ করে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে। তার পর বিড বিড় করে বললে, "পকেটমার মনে হয় ব্যাগটা উঠিয়ে নিয়ে গেছে। জাহাজে ...। ব্যাগটা পকেটেই ছিল। আমি এখন কি করি?"

আমি বললাম, 'তাতে কি হয়েছে? আমি দামটি চুকিয়ে দিচ্ছি।"

বেয়ারাটা চলে গেলে, অসহায়ের মতো আমার হাতটা ধরে সে বললে, —"আমার নাম শশাঙ্ক। আমি বর্মা মল্লুক থেকে পালিয়ে এসেছি। আগে মিলিটারির চাকরি করতাম। এখন পয়সাকড়ি কিছু নেই। আমি একটা রোজগারের রাস্তা পেলে, আপনার দেনাটা চুকিয়ে দেব

আমি বললাম,—"সে হবে এখন। তুমি কি চাকরি চাও?" আমি

সার্কাসের লোক। আগুনের বেড়াজালের ওপর দিয়ে, মোটর বাইক চালান আমার কাজ।—সার্কাসের কাজ পারবে ?

কৃতজ্ঞতার স্বরে সে বললে,—"যে কাজ পাই, তাই লুফে নেব।"

তারপর বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে, আমার পিছুপিছু চলে এল সে সার্কসের তাঁবুতে। তাকে ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ করিয়া দিলাম।

ম্যানেজার তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলল যে সে পূর্ব্বঙ্গবাসী। পার্টিশানে দেশটা আলাদা হবার আগে, খুলনায় তাদের জমি, বাড়ী, সব ছিল। পার্টিশান হবার পর, দাঙ্গায় তার বাড়ী লুঠ হয়—তার বাবা-মা মারা যান, বোনটা হয় অপহৃতা আর সে তার ছোট ভাইএর সঙ্গে কোন রকমে পালিয়ে আসে সীমান্ত পেরিয়ে এখানে তার ছোট ভাই, তার এক বন্ধুর সঙ্গে চলে যায় বম্বেতে আর সেখানে তারা লোহা-লক্করের ছোট কারবার করে। শশাঙ্ক খবরের কাগজে দেখতে পায় যে মিলিটারি সার্ভিসে কিছু লোক রিক্রুট হচ্ছে। সে আগেই ম্যাট্রিকটা পাশ করেছিল। উপায়ন্তর না দেখে, একটা দরখাস্ত সে ছেড়ে দেয়। তার স্বাস্থ্য ভালছিল আর তাই সে বহাল হয়ে যায় মিলিটারির কাজে। তারপর বদলি হয়ে ভারতের অনেক জায়গায় তাকে ঘুরে বেড়াতে হয়। এই সময়ে ব্যারাকে একজন মেজর খুন হন এবং তাঁর বাকস থেকে কিছু গোপনীয় কাগজ উধাও হয়। তখন সবার সন্দেহ পড়ে তার উপড়—কারণ সে পাকিস্তানের রেফিউজী, সুতরাং গুপ্তচরও হতে পারে। সেখান থেকে সে পালায় কোর্ট মার্শালের ভয়ে। তারপব বর্মায় সে পাড়ি দেয়, নাম ভাঁড়িয়ে। কিন্তু বর্মায় গিয়ে কাজকর্মের কিছু সুবিধা হোল না বলেই, তাকে ফিরে আসতে হয় অনেকটা পুনর্মুষিকো ভব হয়ে। এই বোধহয় তার ইতিহাস।

ম্যানেজার তাকে বহাল করে, আমার উপর ছেড়ে দিলেন তার প্রশিক্ষণের ভার। তাকে ভেবে চিন্তে দিলাম ট্রাপিজের কাজ।

ট্রাপিজের কাজ করত একটা মেয়ে—নাম তার ঈশানী। আর একজন লোকের দরকার পড়েছিল সেখানে। একটা বুড়ো ক্লাউন আর আমি তাকে শেখাতাম ট্রাপিজের খেলা আর ঈশানী বসে বসে মজা দেখত। তারপর দু' বছর কেটে গেছে, বাবু। ঈশানী আর শশাঙ্ক এখন ট্রাপিজের পাকা খেলোয়াড় আর আমি নীচে দেখাই আমার একঘেয়ে মজা—মোটর বাইকে চড়ে আগুনের উপর দিয়ে সাঁতার। বাবু, আপনার কি সময় হবে, আজকে একবার আমাদের সার্কাসে যেতে—তাহলে আমার আর শশাঙ্কের দুজনের খেলাই দেখতে পাবেন। এই গেট পাশটা নিননা—

পাশটা আমি পকেটে পুরে বললাম—"ঠিক আছে, যাব। কিন্তু মনিরাম, তোমার মনে ফুর্তি নেই কেন, চার পেগ তো শেষ হলো।"

মনিরাম বললে—"বাবু, আমার মনে হয় যে বোধহয় আমি বেশীদিন বাঁচব না। সাইকেলের খেলা দেখাই আগুন টপকে—বোধহয় ঐ আগুনে জ্বলেই একদিন হবে আমার মরণ। দর্শকরা মজা দেখে আর আমরা তাদের জন্য প্রাণ দিয়ে দেখাই প্রাণান্তকর খেলা। কিন্তু তার জন্য আমার কি'পরোয়া? সংসারে আমারই বা কে আছে? তাই সারাদিন মদ গিলে বেড়াই ভাটিখানায় আর রাত্তিরে দেখাই সার্কাস। লাট্টুর মতো দেশে দেশে সার্কাস করে ঘুরছি আমি, কিন্তু এই জীবনটাকে ঠিক চিনতে পারছি না। মোটর বাইকের খেলা দেখিয়ে বেড়াই পেটের চিন্তায়, কিন্তু বাবু আমার অদৃষ্ট কি সেই বাইকের চাকার মতো চির ঘুর্ণমান—সে কি কোন দুনিয়ার ঘাটে কোনদিন থমকে দাঁড়াবে না?"

এই বলে দুম করে সে উঠে পড়ল আর একটা বাঁকা হাসি হেসে, আমাকে একটা সেলাম ঠুকে সে বেরিয়ে গেল। আমি বসে রইলাম সেখানে গেলাসটা হাতে করে।

এই সময় একটা দমকা হাওয়া ছুটে এল ঝড়ের মাতন নিয়ে। চমকে তাকিয়ে দেখি, জানালার ফোকরে দেখা যায় কালবৈশাখীর

মেঘের স্তূপ। দিনের আলো মরে গেছে আর ঝিলিক মারছে মেঘে মেঘে। গুরু গুরু করে মেঘটা গুমড়ে গুমড়ে ডেকে উঠল এবং কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি টপ্ টপ্ করে ঝরে পড়ল জানালাটার কাচের সার্শীতে।

টেবিলের উপর রাখা খবরের কাগজটা মাতাল হাওয়ায় উড়তে উড়তে পালিয়ে এল আমার পায়ের তলায়। আমি একটু ঝুঁকে সেটা কুড়িয়ে নিলাম। কাগজটা আজকের সকালবেলার। একটা হাই তুলে সেটা ঠোকরাতে লাগলাম অলস ভাবে।

কাগজের দ্বিতীয় পাতায় ক্যাড্‌বেরীর বিজ্ঞাপন—একটা ছোট মেয়ে ক্ষুদে ক্ষুদে দুটো হাত বাড়িয়ে আছে আর একটা ক্যাডবেরীর চকোলেট চুষছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, যে কয়েকদিন আগে এই বিজ্ঞাপনটা দেখেছিলাম কাগজে আর তার ঠিক পাশে ছিল একটা ছোট খবর। খবরটা মনে পড়ল এখন।

সীমান্ত পার হবার সময় ধরা পড়েছে একজন পাঞ্জাবী ব্যবসায়ী। সে মিলিটারি কমিশরিয়টে রসদ জোগাত। তার স্বীকারোক্তিতে যেন ছিল যে কোথাকার এক মেজর সায়েবকে সে খুন করেছিল এবং তাঁর কাছে গচ্ছিত কতকগুলো মিলিটারি এক প্ল্যানের গোপন কাগজপত্র সে চুরি করেছিল সেই সঙ্গে। এমনিতে সে চুরি করতে পারেনি—কারণ অফিসারটি সদা সতর্ক ও সজাগ থাকতেন সব সময়।

বার এর লোকটাকে বললাম দোকানের গুদোমে রাখা সাত দিনের পুরনো সবগুলো খবরের কাগজ এনে দিতে। লোকটা তাড়াতাড়ি চলে গিয়ে কাগজগুলো এনে দিল। সেই পুরনো কাগজের স্তূপে ক্যাডবেরীর বিজ্ঞাপনের সঙ্গে সেই খবরের পাতাটা চোখে পড়ে গেল। আর দেরী না করে সেই খবরের কাগজটা বগলে পুরে বেরিয়ে গেলাম মদের বার থেকে। মাথার উপরে তখন আকাশ স্লেটের মতো কালো। থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর অঝোর ধারায় ঝরছে বৃষ্টি—সাঁ সাঁ হাওয়ায় ছিটকে ছিটকে।

হাওড়া ময়দানে সার্কাসের প্রকাণ্ড তাঁবু। ইলেকট্রিকের আলো সাজিয়ে লেখা—দি গ্রেট ন্যাশনাল সার্কাস। ম্যানেজারের ঘরে ঢুকে পড়লাম। তাঁর সঙ্গে আলাপ করে বললাম যে শশাঙ্ককে আমি চাই এখুনি। শশাঙ্ককে ডেকে দিতে বলে, ম্যানেজার উঠে গেলেন সেই টিনের চালা দেওয়া ঘর থেকে। একটু পরে শশাঙ্ক ঘরে এসে ঢুকল। কালো, ছিপছিপে গড়ন—মুখে একটা লালিত্য আছে তার, তার হাতে খবরের কাগজটা আমি তুলে দিলাম। সে আগ্রহভরে খবরটা যেন গিলতে লাগল। তারপরে তার মুখে ফুটে উঠল বিজয়ীর হাসি। মৃদু হেসে আমায় বললে—"বাবু আপনি তো বেশ। এতবড় খবরটা দিয়ে গেলেন আর ইনাম কিছু নেবেন না। আমি বাবু গরীব লোক। ইনামই বা কি করে দেব? চলুন না সার্কাসে এখন। আমার খেলাও আছে।"

আমি বললাম—"আমার কাছে গেটপাশ মজুত আছে—তোমাদের দলের মনিরামের কাছ থেকে আগেই পেয়ে গেছি।"

ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের মতো শশাঙ্কের চোখদুটো জ্বলে উঠল। সে ঘৃণায় বলল—"শালা মনিরাম। আমার নামে লাগিয়েছে বিষ ঈশানীর কানে। আমি ঈশানীকে ভালবাসি, ঈশানীও আমাকে ভালবাসে। কিন্তু ঐ শালা বলে বেড়ায় যে আমি ফেরারী আসামী, জেলের ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই। ঈশানী আর কী করবে? মনিলালকে বোধহয় তাকে শাদি করতে হবে। এখন আপনার কাছ থেকে খবর পেয়েছি—দেখে নেব শালা মনিলালকে এবার।"

সার্কাসে যখন ঢুকলাম তখন খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে। একটা দড়ির খেলা চলছে তখন। আঁটো সাটো নীল স্কার্টস্ পরা একটি মেয়ে ছাতা হাতে দড়ির উপর দিয়ে হেঁটে চলেছে। সুগঠিত তার দেহ—দুটি রক্তিম অধর স্থূল। মেয়েটি বোধহয় ঈশানী।

মটর সাইকেলটা বাগিয়ে ধরে সার্কাসের মঞ্চের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে মণিরাম আর তার পাশে শশাঙ্ক। দুজনের মধ্যে কি

যে হচ্ছে খোদাই জানেন। যেন দুটো বিষাক্ত সাপ ফণা তুলে ফুঁসছে। শশাঙ্ক তার ডান হাতের মাংস পেশীটা ফুলিয়ে দেখাল যেন মণিরামকে, উদ্ধত ভঙ্গিতে। মণিরাম তার দিকে একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সেখান থেকে সরে গেল।

এই সময় একটা ক্লাউন ব্যাঙের মতো লাফাতে লাফাতে মঞ্চে এসে ঢুকল। তারপরে সে অদ্ভুত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে উঠে কসরৎ দেখাতে লাগল। দর্শকদের মধ্যে উঠল হাস্যরোল। কিন্তু তাতে এতটুকু বিচলিত হতো না ঈশানী বা সেই ক্লাউন। ঈশানী ছাতা হাতে ধরে, কাদা খোঁচার মতো এক পা এক পা করে এগিয়ে আসতে লাগল, ক্লাউনটা বাঁদরের মতো দৌড় মেরে পালাল পর্দ্দার আড়ালে আর সেখান থেকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এল মঞ্চে সিংহের খাঁচাটা। মৃদু হেসে ঈশানী দড়ি থেকে টুপ করে লাফিয়ে পড়ে, মেঝে থেকে একটা হাণ্টার কুড়িয়ে খাঁচার দরজা খুট করে খুলে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

সিংহের খেলা তখন চলছে, এই সময় দপ্ করে সার্কাসের আলোগুলো নিভে গেল। দর্শকদের মধ্যে তখন হট্টগোল সুরু হোল। আমি মনে মনে প্রমাদ গুনলাম। কারণ, যতক্ষণ আলো থাকে মঞ্চে, সিংহ দেখতে থাকে খেলোয়াড়ের চাবুককে আর কিছু সে করে না। কিন্তু মঞ্চে আলো না থাকলে, সিংহ চাবুক দেখতে পায় না —তখন সে খেলোয়াড়ের উপর লাফিয়ে পড়তে পারে।

একটু পরে কানে গেল পিস্তলের গুম্ গুম্ আওয়াজ। তারপর আলোগুলো সব একসঙ্গে জ্বলে উঠল। দেখি, খাঁচার সিংহটা মরে পড়ে রয়েছে থাবাটা উঁচু করে—মাথা থেকে তার ঝরে পড়ছে রক্তের ধারা। ঈশানী খাঁচার ভেতর দাঁড়িয়ে—চোখে তার বিস্ফারিত দৃষ্টি। তার সামনে শশাঙ্ক একটা রিভলভার হাতে নিয়ে হাঁপাচ্ছে। সার্কাসের আলোর ডাইনামোর দিক থেকে মনিরাম বেরিয়ে এল, এ সময়ে আর গ্যালারীর পাশে এসে দাঁড়াল। তার কুটিল মুখে

ঈর্ষ্যা, হিংস্রতা আর ক্ষোভ যেন বাসা বেঁধে রয়েছে। শশাঙ্ক তাকাল তার দিকে। দৃষ্টি দিয়ে ঘৃণা ঝরে পড়ছে মনিরামের উপর।

এইবার সুরু হোল ট্রাপিজের খেলা। এটা ঈশানীরও একটা মাৎ করা খেলা। কত ভঙ্গিতে যে সে টঙ্গে চড়ে হাত পা খেলিয়ে শূন্যে সাঁতার কাটতে লাগল, যে দেখলে তাক লাগে! শশাঙ্ক ঢুকল একটু দেরীতে। তর তর করে সে উঠে গেল যেখানে ঈশানী দড়ি ধরে দুলছে দুজনে উঠে দাঁড়াল একটা কাঠের পাটাতনের উপর। কিন্তু একি! শশাঙ্কের হাতে যে আমার সেই খবরের কাগজটা। সে ফিস্ ফিস্ করে যেন কি ঈশানীকে বলছিল ঈশানীর মুখে ফুটে উঠল হাসি। আর বিজয় গর্ব্বে শশাঙ্ক তার ছিপছিপে শরীরে একটা দোলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ল শূন্যে।

নীচে চারজন লোক একটা চাদর ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। দেখি তাদের মধ্যে একজন মনিরাম। মনিরাম এই সময়ে চাদরের খুঁটটা ছেড়ে দিয়ে, একটু দূরে সরে দাঁড়াল' শশাঙ্ক টপ্ করে একটা ডিগবাজি খেয়ে, নেমে পড়ল মাটিতে এবং তক্ষুনি খুঁটটা টেনে ধরল হাতে। ইতিমধ্যে ঈশানী ঝাঁপিয়ে পড়েছে নীচে। সে পড়ল এবার চাদরের উপর ঠিক সময়ে টুপ করে, বৃন্তচ্যুত ফলের মতো।

ইণ্টারভ্যালের পর চলল খেলার পর খেলা। আমি অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করে রইলাম কখন দেখব মনিরামের মোটর বাইকের খেলা। সেটা বোধহয় হলো শেষ দৃশ্যে। আগুন জ্বালা৹ হলো মঞ্চের মাঝখানে। তার চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হলো বালির আস্তরণ। মনিরাম সাইকেল হাতে একটা বাঁকা স্যালুট করল দর্শকদের—বোধহয় আমাকেও। এবার সাইকেলে চড়ে স্পীড দিল, মোটরে কট্ কট্ করতে লাগল যন্ত্রটা। গোঁ গোঁ করে সুরু হোল তার মঞ্চের চারিদিকে পরিক্রমণ। এবার যেই সে আগুনটা অতিক্রম করতে যাবে, তখনই শোনা গেল চারিদিকে থেকে তীব্র আর্ত্তনাদ—

কারণ মণিবাম সীট থেকে লাফ দিয়ে পড়েছে জ্বলন্ত অগ্নিতে পাশে ছিটকে পড়া মোটর বাইকটা ধুকছে কট্ কট্ করে আর চাকাগুলো বন্ বন্ করে ঘুরছে কাৎ হয়ে পড়া বাইকের পেছনে।

আমি ছুটে গেলাম সেখানে গ্যালারি থেকে। মণিরামের আধ-পোড়া দেহটা টেনে হিঁচড়ে বার করা হলো অগ্নিকুণ্ড থেকে। সে তখন হাঁপাচ্ছে। আমার দিকে মরনাহত চোখে তাকিয়ে বলল—"বাবুজী এই তো আমার কিসমৎ। আজ বিকেলে বারেতেই তো আপনাকে বলেছি, যে মরণ বোধহয় আমার বাইকের বাজীতে। আমার জীবনের এই তো বাজীমাৎ। রাহু যদি থাকে চাঁদকে ঘিরে, তাহলে চাঁদ হাসবে কি করে আকাশে? মেঘে ঢাকাই যদি থাকে তপন, তাহালে ফুল ফুটবে কি করে ফাগুনে? তাই রাহুকে সবে পড়তে হয়। আমি মরছি, তবু আমি খেলোয়াড়।"

সারাদিন খাটুনিই গিয়াছে।

স্নান সারিয়া হাতমুখ ভাল করিয়া মুছিয়া শৈল এবার একটা ফরসা কাপড় পরিবে, পরিয়া বাঁচিবে। আঃ! এত কি আর একলা পারা যায়! যত রাজ্যের খবরের কাগজ, মাসিকপত্র, নবপ্রকাশিত কবিতার বই, উপন্যাস, নাটক, কত কি? তার সঙ্গে আবার বন্ধুদের অর্ধভুক্ত সিগারেট, বিড়ি, কি যে নাই—ভাবা যায় না!

সবই আজ সে পরিষ্কার করিয়াছে! মাগো কি ঘেন্না! ঐ সব যত লোকের এঁটো সিগারেট-বিড়িগুলো হাত দিয়ে সরাইয়া আবার স্নান না করিয়া থাকা যায়! হোক না শীতের বিকাল, ঐ সব আবর্জনা পরিষ্কার করিয়া স্নান না করিলে কি আর রাত্রে ঘুম হইবে!

না, আর একবার ঘাড়ে-পিঠে সাবানটা বুলাইয়া লওয়া যাক, যা ধুলা আজ সারাদিনটা চোখেমুখে ঢুকেছে! আর একটু বেশী জল গায়ে দিতে হবে।

কিন্তু বাড়ি আসিয়া আজ টের পাইবেন এখন! ঘরের চাবি তো কোন কালেই দেওয়া হয় না—আজ কিন্তু বেশ মজাটা দেখিবেন। কেমন জব্দ! শৈল পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, চাবি খুলিয়া ঠাকুরমার আচার চুরি করা কত ছোটবেলা হইতে অভ্যাস, তাহাকে কি না চার আনার একটা তালার ভয় দেখান! শৈলর হাসিই পাইল! আনন্দে আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে লাগিল সে!

নিরঞ্জন ভোরবেলা কোন এক শহরতলীতে গিয়াছে, সেখানে তাঁহার ও তাঁহার বন্ধুদের সাহিত্যবাসর না কি-এক মাথামুণ্ডু আছে; শৈল আজ তাই সুযোগ পাইয়াছে স্বামীর পড়ার ঘরটা পরিষ্কার করিববার। কতকালের আবর্জনা যে ঐ ঘরে জমা ছিল—মাগো মা, মানুষের একটু ঘেন্নাও করে না।

তাই কি শৈল বড় সহজে পারিয়াছে ! নিরঞ্জন তাঁহার পড়ার ঘরে শৈলকে ঝাঁটা ঢুকাইতে দেয় না ; তাহার ভয়, কত টুকরা কাগজপত্র আছে, কত বিষম দরকারী বই আলমারীর তলায় হয়ত তিন ভাঁজ হইয়া পড়িয়া আছে। শৈল সে-সব চিনিবে কেমন করিয়া ! সবই ঝাঁটাইয়া বিদায় করিয়া দিবে। তার চেয়ে ঘর পরিষ্কারের দরকার নাই।

শৈল কত বার বলিয়াছে—তুমি একটু বাইরে দাঁড়িয়ে দেখ লক্ষ্মীটি, আমি তোমার সমুখেই ঝাঁট দিয়ে দিই। কিন্তু নিরঞ্জনের সময় কোথায় ! শৈল ঝাঁট দিবে আর নিরঞ্জন দেখবে—এত বেশী ধৈর্য থাকিলে তো নিরঞ্জন জীবনে অনেক কিছুই করিতে পারিত। রবিবার একটু সময় অবশ্য পাওয়া যায়, কিন্তু ছয় দিন পর ঐ এক দিনের ছুটিটাকে নিরঞ্জন মাটি করিবে শৈলকে ঘর ঝাঁট দেওয়াইয়া। না, এত নিষ্ঠুর নয় নিরঞ্জন।

কিন্তু শৈলর সহ্য হয় না। মনে পড়ে তাহার উন্মুক্ত পল্লীর কোলে গোবর-নিকানো মেটেঘর—চারিদিক্ রোদে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে, কোথাও এতটুকু আবর্জনা নাই। প্রকাণ্ড উঠানটায় একটি কণাকড়ি পড়িয়া থাকিলে গোবরের শ্যামাভ রঙে তাহা সুন্দর শ্বেতকলঙ্কের সৃষ্টি করে! একটি ছোট্ট চড়াইপাখী আসিলেও নজর এড়াইয়া যায় না। আর এই বিশাল শহরের বিরাট অট্টালিকার ভীড়ে এঁদো গলির মধ্যে দোতলার ছুটি কুঠরী। তাও একটাতে তো বই আর বই, বন্ধু আর বিড়ি-পোড়া, আর একটায় গোটাচারেক ট্রাঙ্ক ও দুখান দেওয়াল-আলমারীর মাঝে কোন রকমে তাহাদের শয্যাখানি পাতা। বাব্বা ! শৈলর প্রাণ হাঁফাইয়া ওঠে। কিন্তু উপাই নাই। নিরঞ্জন শতাব্দীকাল ঐ বই, বন্ধু ও বিড়ি-পোড়া লইয়া থাকিবে, তবু শৈলকে ও-ঘরে ঢুকিতে দিবে না। আজ সেই নিরঞ্জন টেরটা পাইবে এখন।

বেশবাশ করিয়া শৈল জানালায় আসিয়া দাঁড়াইল। সখী পূর্ণিমা অনেকক্ষণ পূর্বেই ওদিকের বাড়ির জানালাটাতে বসিয়া আছে। হাসিয়া বলিল, “আজ এত দেরি কেন ভাই ?”

শৈল সালঙ্কারে সখীকে ব্যাপারটা বলিতে লাগিল। বন্ধু ও বিড়ির জ্বালায় তু-জনেই যে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে, ইহাতে তু-জনেই সমান আনন্দিত হইল। শেষটায় শৈল বলিল যে, পূর্ণিমার স্বামী তবু অনেক ভাল, ঘর নোংরা করে না, বন্ধুদের জন্য দিনে অন্ততঃ পঁচিশ বার পূর্ণিমাকে চা করিতে হয় না এবং পূর্ণিমার স্বামীর পড়িবার ঘরের বালাই নাই।

পূর্ণিমা কিন্তু ইহাতে খুশি না-হইয়া বলিল, "না ভাই, পুরুষমানুষ, একটু পড়াশুনো করবে বই কি; তাছাড়া তোমার স্বামী ভাই বিদ্বান্ মানুষ। রোজই তো তাঁর নাম কাগজে দেখি। ও রকম লোকের বৌ হওয়া কিন্তু ভাই ভাগ্যির কথা।"

শৈল একটু হাসিল। তাহার স্বামী তাহার গর্বের বস্তু—নিশ্চয়ই। বাংলা-সাহিত্যের তিনি প্রতিষ্ঠাপন্ন কবি, সাহিত্যিক। তাঁহার নাম না-শুনিয়াছে, তাঁহার গল্প না-পড়িয়াছে, এমন মেয়ে একটাও শৈল দেখে নাই। এই তো পূজার পূর্বে যখন তাহারা দেওঘব যাইতেছিল, গাড়িতে কি ভীড়! মেয়ে-কামরায় একটুও জায়গা নাই। কোনরকমে নিরঞ্জন শৈলকে কামরার মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। শৈল বসিবার জায়গাই পায় না, এমন সময় গাড়ির এক কোণ হইতে একটি তরুণী আসিয়া শৈলকে বিনীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"কিছু যদি মনে না করেন—একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।"

শৈল বলিল, "না, মনে কি করব—বলুন?"

—উনি কি নিরঞ্জনবাবু—কবি নিরঞ্জন চক্রবর্তী?

—হ্যাঁ।

—আপনাব? স্বামী! কেমন?

হ্যাঁ।

আর যায় কোথা! শৈল যেন গাড়ির মধ্যে একটা মহা সম্মানের পাত্রী হইয়া প'ড়ল। তৎক্ষণাৎ একটা বেঞ্চির মাঝখানে তাহার জন্য জায়গা হইয়া গেল। সকলেই নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

নিরঞ্জনবাবু কি খাইতে ভালবাসেন, কখন লেখেন, কখন ঘুমান, দিনে কয়টা সিগারেট তাঁহার লাগে, ইত্যাদি অসংখ্য প্রশ্নে সকলে তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছেন। কি তাহাদের সৌজন্য, কি শ্রদ্ধা! সেদিনও শৈল সেই পঁচিশ-ত্রিশটি মেয়ের মধ্যে এমন একজনও দেখে নাই যে নিরঞ্জনের গল্প না-পড়িয়াছে।

পূর্ণিমা ঠিকই তো বলিতেছে। শৈলর মত স্বামী কয়জন নারীর ভাগ্যে মিলে। কিন্তু কোথায় যেন শৈলর বাধিতেছিল! কি যেন একটা ব্যাথা তাহাকে ম্রিয়মাণ করিয়া দিল।

অকস্মাৎ সে সন্ধ্যা-প্রদীপ দিবার ছল করিয়া পূর্ণিমার কাছে বিদায় লইয়া চলিয়া আসিল। সন্ধ্যার তখনও সময় হয় নাই। শৈল আসিয়া এদিকের বারান্দায় দাঁড়াইল। আকাশের এক প্রান্ত দেখা যায়। পশ্চিমাকাশ লাল হইয়া উঠিয়াছে, দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর। এমনি সময় তাহাদের গ্রামে গাঙুটি পালের গরু বাড়ি ফেরে। শৈল এতক্ষণ খড় কাটিয়া, খৈল মাখাইয়া মঙ্গলী গাইটার জন্য খাবার তৈরী করিয়া রাখিত। মঙ্গলী গাইটার বাছুর হইয়াছে, মা লিখিয়াছেন; কতটা দুধ দিতেছে কে জানে। শৈল থাকিলে তাহার যে রকম যত্ন হইত, তাহা কে জানে কি হইবে!

ও-দিকে ছাদটার আলিসায় সেই ঝাঁকড়া চুল ছেলেটা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। শৈল মুখ ফিরাইল! কি যে অদ্ভুত এই সব ছেলের দল। শৈলর গা জ্বালা করে। শৈল ঘরে ঢুকিয়া সন্ধ্যা-প্রদীপ সাজাইল। দীপ জ্বালাইয়া শঙ্খধ্বনি করিয়া ঘরের দেওয়ালে টাঙান দেবমূর্তির পায়ে প্রণাম করিল।

এইবার? এইবার সে করিবে কি? নিরঞ্জন বলিয়া গিয়াছে, ফিরিতে রাত্রি এগারোটার কম নয়। এই সন্ধ্যা হইতে রান্না চড়াইলে সবই যে ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে, তার উপর শীতের রাত্রি। রান্না একটু দেরী করিয়াই চড়াইবে শৈল। কিন্তু ততক্ষণ যে প্রচুর অবসর, তাহা সে ভরাইয়া রাখিবে কি দিয়া? পূর্ণিমা ত রান্নাঘরে ঢুকিয়াছে—

সকলেই ঢুকিয়াছে। শৈলও অন্যদিন এতক্ষণ উনানশালে বসিয়া রান্না করে। কিন্তু আজ যে তাহার সময় আর ফুরাইতে চাহিতেছে না। অবশ্য, দিনের বেলা এত বেশী কাজ সে করিয়াছে যে রান্নার সুবিধা হয় নাই। ঘরের সঞ্চিত চিঁড়া ভিজাইয়া খাইয়াছে। এবেলা ভাত না খাইলে অস্বস্তি বোধ করিবে সে। কিন্তু নিজের সুবিধার জন্য এত আগে শৈল রান্না করিলে, নিরঞ্জন যে সে-ভাত মুখে তুলিতেই পারিবে না। না কাজ নাই। শৈল আর একবার আসিয়া নিরঞ্জনের পড়ার ঘরে ঢুকিল, সুইচ টিপিতেই ঘরখানি যেন হাসিয়া উঠিল। চারিদিকে নানা রকম বই, সবগুলি আজ সে ঝাড়িয়া মুছিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে। কত রঙের সুন্দর সুন্দর মলাট, কত ছবি,·কি যে আছে উহাদের মধ্যে! ইহারা তাহার স্বামীর নিত্যকার সঙ্গী। নিরঞ্জনের কাছে ইহারা শৈলর অপেক্ষা প্রিয়; কিন্তু নিরঞ্জনের সেই স্নেহ বাহ্যতঃ ইহাদের উপর প্রকাশ পায় না। ধূলায় ইহাদের অঙ্গ ভরিয়া উঠে, মলাটের পাতা খসিয়া যায়, পাতা ছিঁড়িয়া পড়ে, ইহারা করুণ দৃষ্টিতে শৈলর মুখপানে যেন চাহিয়া থাকে একটু আদর পাইবার জন্য, একটু মাতৃস্নেহ পাইবার অপেক্ষায়। কত বিদেশী-বইয়ের শক্ত মলাট খুলিয়া গিয়াছে, কত দেশী বইয়ের পাতা বিড়ির আগুনে পুড়িয়াছে, কত বৃহদাকার মাসিক পত্রগুলি দুমড়াইয়া গিয়াছে—শৈল দেখে আর নীরব সহানুভূতিতে তাহার অন্তর ভরিয়া যায়। তথাপি সে কোন দিন ইহাদের একটু আদর করিতে পারে না।—একটু ছুঁইতে পারে না। এমনি নির্মম শাসন নিরঞ্জনের।

হ্যাঁ, আজ শৈল একটা কাজের মত কাজ করিয়াছে। তাহার স্বামীর প্রিয় সঙ্গীগুলিকে স্নেহ দিয়া, ভালোবাসা দিয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছে। আনন্দে উহারা যেন খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছে। কে উহারা, কেমন উহারা, শৈল চেনে না, কেন যে নিরঞ্জন উহাদিগকে এত ভালোবাসে তাহাও শৈল বোঝে না—

শৈল শুধু জানে ঐ বইগুলি নিরঞ্জনের অত্যন্ত প্রিয়। প্রিয়, কিন্তু

নিরঞ্জন উহাদের যত্ন করিতে জানে না। সে শুধুই দু-চোখের অগাধ তৃষ্ণা দিয়া উহাদের রস শুষিয়া লয়, হৃদয় ভরিয়া তাহা পান করে, তাহার পর বন্ধুদের সঙ্গে বিড়ি টানিয়া উহাদের কথা লইয়া মাতামাতি করে; কিন্তু আশ্চর্য। উহাদের পার্থিব দেহের যত্নও যে করা উচিত নিরঞ্জন মনে করে না। পুরুষ মানুষ এমনই হয়। স্বার্থপর!

ঘড়িটায় আটটা ঘা পড়িল। না, আর বসিয়া থাকা ভাল নয়, রান্না করিতে হইবে। শৈল উঠিল। বেশী কি আর রান্না; ডাল ভাত তরকারি। শৈল তাহাই আস্তে আস্তে রাঁধিতে লাগিল। দশটা ঘা ঘড়িতে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই রান্না তাহার শেষ হইয়া গেল। এখনও যে অনেকক্ষণ দেরী খাবার যাহাতে ঠাণ্ডা হইয়া না যায়, শৈল তাহার জন্য জল গরম করিয়া খাবার বসাইয়া রাখিল। আসনটা তুলিয়া পাতিল, বিছানাটা একটু ঝাড়িয়া আসিল;—না, সময় আর কাটে না। কি সে করিবে!

পূর্ণিমা কিন্তু বেশ। হাতে কাজ না থাকিলে গল্পের বই পড়ে, সে বই আবার শৈলর কাছেই চাহিয়া লয়। রাত্রে পড়িবার জন্য নিরঞ্জন মাথার বালিসের নীচে যে দু-একখানা টাটকা মাসিকপত্র রাখে, শৈল তাহাই সখীকে পড়িতে দেয়, না হইলে নিরঞ্জনের পড়িবার ঘরে তো তার প্রবেশ নিষেধ! শৈলর দেওয়া বইয়ের গল্প পড়িয়া কখনও কখনও পূর্ণিমা কাঁদিয়া ফেলে, বলে, তোমার স্বামীর লেখা গল্পটা পড়লুম ভাই আর কি সুন্দর, কি করুণ! আবার কখনও বা হাসিয়া লুটাইয়া পড়ে, বলে—"প'ড়ে দেখো ভাই, কি মজার গল্প! হেসে তো আমার পেটের নাড়ী উল্টে আসছে—"

শৈল একটু হাসে, একটু করুণ হাসি। পূর্ণিমা কিছু বুঝিতে পারে না। আপনার মনে বলিয়া চলে—কি সুন্দর লেখেন ভাই তোমার উনি। যেটা পড়ি সেইটেতেই ভাবি, যেন ঠিক আমার কথাটাই লিখেছেন। কি ক'রে লেখেন ভাই! শৈল আবার হাসে, তেমনি ম্লান হাসি। পূর্ণিমা বলে, আচ্ছা ভাই শৈ, এই যে সেদিন গল্পটা

পড়লুম "রাতের বিরহ" সে তো দেখি তোমাকে নিয়ে লেখা—তোমাকে এমন সুন্দর ক'রে এঁকেছেন তাতে, তুমি পড়েছ নিশ্চয় গল্পটি ?

শৈল নীরবে তেমনি হাসে।

চতুর্দিকে তাহার স্বামীর স্তবগান। পাড়ার তরুণীরা তাহার কাছে সরাসরি আসিয়া বলে—আপনার স্বামীর দু-একটা লেখা ছাপার আগে দেখাতে পারেন না ? দেখান না একটু ? শৈল মৃদু হাসিয়া বলে, —ছাপা হলেই পড়বেন ভাই, তার আগে পড়লে ছাপা বইগুলো বিকোবে কি ক'রে ?

শৈলের উত্তর খুবই সমীচীন। কেহই আর কথা কয়না। কিছুক্ষণ পরে একজন বলে—আচ্ছা শৈলদি, আপনি নিশ্চই ছাপা হবার আগে গল্পগুলো পড়ে নেন ? অন্যজন বলে, তুই কি বোকা রে। শৈলদির প্রেরণাতেই তো গল্প লেখা হয়। কাজেই ধরে নিতে হবে ; নিরঞ্জনবাবু নিজেই ওঁকে পড়ে শোনান নতুন লেখা। না শৈলদি ?

শৈল আবার হাসে, কোন জবাব দেয় না।

ঘড়িতে এগার ঘা বাজিল। এবার তাহা হইলে আসিতেছেন। উঃ। কি দীর্ঘ প্রতীক্ষা। ওই যে !

শৈল দরজা খুলিয়া দিলে নিরঞ্জন ঘরে ঢুকিল। গলায় তাহাব পুষ্পমাল্য, কপালে চন্দনলেখা, হাতে রৌপ্যপেটিকা।

শৈল অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া নিরঞ্জন তাহাকে কাছে টানিয়া বলিল—চিনতে পারছ না নাকি ?

শৈল্য কৌতুক-হাস্যে বলিল—বিয়ে ক'রে এলে বুঝি ? বৌ কই ?

নিজের গলার পুষ্পমাল্যটি তাহার গলায় পরাইতে পরাইতে নিরঞ্জন কহিল—এই যে !

আনন্দে শৈলর সর্বাঙ্গ শিহরিতে লাগিল। পরে উঠিয়া রৌপ্য-পেটিকাটি লইয়া সে ধীরে ধীরে নিরঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করিল—এটাতে কি আছে, খুলব ?

জামা খুলিতে খুলিতে নিরঞ্জন ব্যঙ্গহাস্যে বলিল—ও খুলে সুবিধে করতে পারবে না ; তপ্‌সে মাছ নয়। ওতে আছে মানপত্র।

—মানপত্র! সে আবার কি জিনিস?

—দরকার নেই জেনে। দাও, রেখে দিই—বলিয়া নিরঞ্জন তাহার হাত হইতে সেটা ছিনাইয়া লইল! শৈলব অন্তর ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইতেছিল—সে অতিকষ্টে চাপিয়া গেল। না, দুঃখ করিয়া আজ আর কোন ফল নাই। জামাটা খুলিয়া টাঙাইয়া রাখিয়া নিরঞ্জন গিয়া তাহার পড়ার ঘরের দরজা খুলিবার জন্য তালাতে চাবি লাগাইল। আশায় ও আনন্দে শৈলর বুকের ভিতর ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করিতে লাগিল। আর আধ মিনিট পরেই নিরঞ্জন দেখিবে, দেখিয়া বিস্মিত, মুগ্ধ হইয়া যাইবে। তাহার আদরের বইগুলি কত যত্নে সাজিয়া-গুজিয়া তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছে, ঠিক প্রতি বৈকালের শৈলর মতই।

নিরঞ্জন চাবি খুলিয়া সুইচ টিপিল। মুহূর্তে ঘর হাসিয়া উঠিল তাহার চোখের উপর। সুন্দরী! সারা অঙ্গে যেন তাহার বসন্তের শোভা জাগিয়াছে। নিরঞ্জন সত্যই মুগ্ধ হইল, কিন্তু—

নিরঞ্জন ছুটিয়া শেল্‌ফটার কাছে গেল। তার পরই আসিয়া দাঁড়াইল টেবিলটার কাছে। ড্রয়ার টানিল, টেবিলের উপরকার ব্লটিং প্যাড্‌টা তুলিয়া দেখিল, তার পর চেঁচাইয়া উঠিল—আমার সেই কানকোঁড়া কাগজগুলো কই—শৈল! কোথায় রেখেছ?

—কোন্ কাগজ! শৈল ভীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল!

—লালচে রঙের কাগজ—কোণায় পিন দিয়ে আটকানো?

—পিন দিয়ে আটকানো? সে রকম কাগজ তো ছিল না!

সেকি শৈল! সর্বনাশ করেছ। কেন তুমি ঘর গোছাতে এলে শৈল, কেন আমার এমন সর্বনাশ করলে?

নিরঞ্জনের সমস্ত মুখ রাগে দুঃখে ফুলিয়া উঠিল। মুহূর্তে সে ঘরের সমস্ত বইখাতা ওলটপালট করিয়া টানিয়া ছুঁড়িয়া মেঝেতে ফেলিয়া

তাহার সেই কোণায় পিন আটকানো কাগজ খুঁজিতে লাগিল। পনর মিনিটেই ঘরখানা বই আর কাগজের স্তূপে একাকার হইয়া গেল। শৈল সব দেখিয়া একেবারে কাঠ হইয়া গিয়াছে। কোথাও না পাইয়া নিরঞ্জন বলিল,—কোথায় ফেলেছ ময়লাগুলো বল, শীঘ্রি বল শৈল—খুঁজে দেখি। বাইরে ফেলে দিয়েছ কি?

শৈলর নিকট হইতে কোন উত্তর আসিল না। নিরঞ্জন ধমক দিয়ে বলিল—ন্যাকামি রাখ—কোথায় ফেলেছ?

—ঝি বাসন ধুতে এলে তাকে দিয়ে বাইরে সব ছেঁড়া কাগজ ফেলে দিয়েছি—অতিশয় ভীতকণ্ঠে শৈল উত্তর দিল।

—কখন?

—বৈকালে! শৈলর গলা প্রায় বন্ধ হইয়া আসিতেছিল।

নিরঞ্জন এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করিয়া ছুটিল বাহিরে। শৈল নির্বাক হইয়া থাম ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দশ মিনিট, পনর মিনিট, আধ ঘণ্টা—নিরঞ্জন ফিরিল।—নাঃ ওকি আর পাওয়া যায়? ছিঃ ছিঃ! কে তোমাকে আমার ঘর পরিষ্কার করতে বলল? কেন তুমি গেলে ও ঘরে? বল, উত্তর দাও। তুমি জান না, কোনটা কাজের আর কোন্‌টা বাজে, তোমার এত সদ্দারী করতে যাওয়া কেন?

গর্জন করিয়া বলিল, দাঁড়িয়ে কেন? যাও—আমার আর খাওয়া-দাওয়ার দরকার নেই—যাও শোও গে। ওঃ এত কষ্টে লেখা—গায়ের রক্ত জল করে লেখা নাটকখানা নষ্ট হয়ে গেল। ওর আর কোথাও কপি নাই যে উদ্ধার হবে। হায় হায়—নিরঞ্জন সত্যই কাঁদিয়া ফেলিল। মনে পড়িল, কত রাত্রি সে জাগিয়া কাটাইয়াছে ঐ নাটকটি লিখিবার জন্য। শৈল ঘুমাইলে অন্তত দুই ঘণ্টা সে জাগিয়াছে। দিনের বেলা সময় বেশী পায় না সে, তাই রাত্রিতেই তাহাকে লিখিতে হয়। নাটকটি তাহার সমস্ত সাহিত্যিক বন্ধুই প্রশংসা করিয়াছে। শেষ হইলে উহা হয়তো নিরঞ্জনের আর একটা গৌরবের জয়মাল্য আনিতে পারিত! দুঃখে নিরঞ্জনের মস্তিষ্কের ঠিক ছিল না; প্রস্তরবৎ দণ্ডায়মানা শৈলকে

একটা জোরে ঠেলা দিয়া শোবার ঘরে ঢুকাইয়া দিতে দিতে সে বলিল যাও, তোমার মুখ দেখলে রাগ সামলাতে পারছি না। নিরঞ্জন বাহিরে আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

তাহার ভাগ্যই এইরূপ; নতুবা এই বিংশ শতাব্দীতে কাহার ভাগ্যে এমন হয় যে, নিজের স্ত্রী স্বামীর বহু যত্নে লিখিত পাণ্ডুলিপি ডাস্টবিনে ফেলিয়া দেয়! দুঃখ করিয়া লাভ নেই—কপালে যাহা লেখা আছে তাহাই তো ঘটিবে।

কিন্তু মন যে মানিতে চাহে না। অমন সুন্দর নাটকটা! একটা ছেলে মরিয়া গেলে কত দুঃখ হয় নিরঞ্জন জানে না, কিন্তু সে জানে যে নিজের লেখা বইয়ের একমাত্র পাণ্ডুলিপি হারাইয়া যাওয়ার শোক অপেক্ষা পুত্রশোক বেশী নয়। তাহার দুই চোখ ভরিয়া আবার জল আসিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ—অনেকক্ষণ ভাবিয়া সে একটু প্রকৃতিস্থ হইতেই মনে পড়িল, শৈলকে সে খুব বেশী তিরস্কার করিয়াছে। এতটা কেন করিল! যাহা হইবার হইয়াছে, অনর্থক আর—কিন্তু নিরঞ্জন ভুলিতে পারিতেছে না যে, এ-যুগে শৈল ছাড়া আর কোন মেয়েই এমনটা করিত না। নিজের অদৃষ্টের জন্য নিরঞ্জন আর কখনও এত বেশী ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বুকের ভিতরটা তাহার মুচড়াইয়া উঠিল।

কিন্তু উপায় নাই। নিরঞ্জন ধীরে ধীরে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। রাত্রি তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। নিরঞ্জন একবার চাহিয়া দেখিল, শৈল খাটের পায়া ধরিয়া পাথরের মূর্তির মতই দাঁড়াইয়া আছে; মুখ তাহার অন্য দিকে থাকায় দেখিতে পাইল না, দেখিবার ইচ্ছাও ছিল না। শৈলকে দেখিলে আজ তাহার রাগই বাড়িয়া যাইতেছে। নিরঞ্জন পাশ ফিরিয়া শুইল। কোন সহানুভূতিই সে দেখাইবে না! যাহার যেমন কর্ম, সে তেমন ফল ভোগ করুক। থাকুক শৈল দাঁড়াইয়া। নিরঞ্জন চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল।

*　　*　　*　　*

সকালে ঠাণ্ডা হাত গায়ে লাগিতেই ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চোখ খুলিয়াই নিরঞ্জন দেখিল, হাতে চা এবং কোণে সূতা বাঁধা একটা খাতা বুকের উপর চাপিয়া সে দাঁড়াইয়া আছে।

নিরঞ্জন গত রাত্রে যেন একটা তুঃস্বপ্ন দেখিয়াছে। সারা গায়ে তাহার ব্যাথা। চায়ের কাপটা লইয়া প্রথমেই সে তুই চুমুক খাইয়া ফেলিল।

শৈল খাতাটা তাহার চোখের সুমুখে ধরিয়া বলিল, দেখ দেখি, এইটা নয়?

উৎকণ্ঠায় উদ্বেগে শৈলর মুখখানি করুণ দেখাইতেছে। যেন নিরঞ্জনের উত্তরের উপর তাহার জীবন-মরণ নির্ভর করে। নিরঞ্জন তাহার মুখের পানে চাহিল, কি নিদারুণ বেদনা ও ক্লান্তিতে সে-মুখ ছাইয়া গিয়াছে! সন্তানহারা জননীর ব্যাথা কি এমনই, না ইহাব চেয়েও বেশী?

নিরঞ্জন বলিতে পারিল না যে, ইহা তাহাদের ক্লাবের খুচরা হিসাবের খাতা। সে হাসি মুখে বলিল, হ্যাঁ, এই তো, আমি ঘুমুলে খুঁজে পেয়েছ বুঝি?

আনন্দে শৈলর তুটি চোখে অশ্রু উথলিয়া পড়িল।

———

সরযূকে আজ দেখিতে আসিবে।

মা সকাল হইতে তাড়া দিতেছেন গা-হাত ধুইবার জন্য। ভালরূপ সাজিয়া-গুজিয়া না দেখাইলে পোড়ার মুখ লোকের কি আর পছন্দ হয়! যদিও সরযূর চেহারা পাড়ার অন্য পাঁচটা মেয়ে অপেক্ষা ভালই এবং স্বাস্থ্যও তাহার দেখিবার মত, তথাপি মার সর্বদা ভয় হইতেছে, যদি তাহারা পছন্দ না করে!

পছন্দ করিবার জন্য মা-বাবা যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন এত দিন। বাবা কেরাণী হইয়াও বহু কষ্টার্জিত অর্থে তাহাকে ম্যাট্রিক পাশ করাইয়াছেন, সেলাই, বুনন শেখাইয়াছেন, গানও শেখাইবার ব্যবস্থার ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু গলা ভাল না থাকায় সরযূর গান শেখা হইল না। তাই তাহার বাবা আল্পনা ও চিত্রাঙ্কন কার্যে তাহাকে দক্ষ করিয়া তাহার কলানুরাগিতা প্রমাণের জন্য আজ সাত মাস হইতে এক আর্টিষ্ট টিচার পুষিতেছেন।

ওদিকে মায়ের যত্নেরও ত্রুটি নাই, তিনি চপ্, কাট্‌লেট, কালিয়া হইতে পোলাও, কোর্মা সবই মেয়েকে রাঁধিতে শিখাইয়াছেন। এই শিক্ষার ব্যয়নির্বাহ করিতে বাপকে কম কষ্টটা ভোগ করিতে হয় নাই, এবং প্রথম প্রথম সরযূর অপটু হাতের কদর্য রান্না খাইয়াও তাহাকে প্রশংসা করিয়া উৎসাহ দিতে হইয়াছে। সেই সরযূর সমস্ত শিক্ষার আজ পরীক্ষা।

বেলা তিনটা বাজিয়া গেল। চারটার সময় তাঁহারা আসিবেন। সরযূ যে এখনো ঘরের ভিতর বসিয়া আছে। আশ্চর্য! মা চীৎকার করিয়া বলিলেন—ও সরযূ, উঠে আয়না মা, আর আধঘণ্টার মধ্যে যে এসে পড়বে সব। আচ্ছা মেয়ে বাপু তোরা হয়েছিস।

সরযূ কোনদিন কারো কথায় প্রতিবাদ করে নাই, আজও করিল না। গা ধুইয়া পোষাকী কাপড়-চোপড় পরিয়া পটের ছবিতে সাজিয়া সে বসিয়া রহিল। মা তাহাকে পাড়ার পাঁচজনের নিকট হইতে চাহিয়া চিন্তিয়া যতগুলি গহনা পরাইয়া দিয়াছেন, সবই সরযূ নির্বিবাদে পরিয়া আছে। সকলেই বলিল—কী লক্ষ্মী মেয়ে! একে কি কেউ পছন্দ না করে পারে!

মেয়ে কিন্তু ভাবিতেছে—পছন্দ না করিলেই যেন সে বাঁচিয়া যায়। তাহার ষোড়শ বৎসরের মুক্ত কৌমার্যকে ইহারা কেন যে বিবাহের শৃঙ্খলে বাঁধিয়া ফেলিতে চাহিতেছে। তবুও সরযূ প্রতিবাদ করিল না। প্রতিবাদ করা তাহার স্বভাবে নাই।

কন্যা পছন্দ হইল এবং বিবাহ হইয়া গেল। যাহার সহিত বিবাহ হইল, সে মানুষটি নাকি কলেজে পড়িতেছে। সরযূ তখনো তাহাকে ভাল করিয়া দেখে নাই। আজই উহার সহিত গাঁটছড়া-বাঁধা অবস্থায় তাহাকে চিরপরিচিত কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতে হইবে পশ্চিমবঙ্গের কোন এক অখ্যাত পল্লীতে। সেইখানেই উহাদের পৈত্রিক ভিটা। সরযূর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। পাড়াগাঁয়ে সে কখনো যায় নাই—সেখানকার মশা-ম্যালেরিয়ার সঙ্গে ভূত শাঁকচুন্নির কথা সে পুস্তকে পড়িয়াছে, এবং পড়িয়া পড়িয়া তাহার মনে একটা বদ্ধমূল ধারনা জন্মিয়াছে যে, কাব্যে-উপন্যাসে পল্লীর অতি লোভনীয় চিত্র থাকিলেও মশা, ম্যালেরিয়ার সঙ্গে সাপ, বাঘ, শাঁকচুন্নির অভাব নাই। তবু তাহাকে সেখানে যাইতে হইবে। সরযূ এবারও কোন কথা বলিল না, নীরবে স্বামীর অনুগমন করিল।

স্টেশন হইতে ক্রোশখানেক পাল্কীতে আসিয়া পৌঁছিল শ্বশুর বাড়িতে। বিরাট এক প্রাসাদ—ইট, সুরকী খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে। পশ্চিমদিকের একটা প্রান্ত কবে কোন দুর্যোগ রজনীতে ধ্বসিয়া পড়িয়া বহু পুরাতন যুগের স্তূপের মত দেখাইতেছে।

অন্তঃপুর-সংলগ্ন বিশাল পুষ্করিণীর চতুষ্পার্শ্বে সুবিস্তৃত আম্রকানন পুরাকালের তপোবনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সরযূ চাহিয়া চাহিয়া নির্বাক বিস্ময়ে সমস্ত দেখিল। দেখিয়া দেখিয়া মন তাহার আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িল। কিন্তু উপায় নাই—তাহাকে এই ক্ষুধিত পাষাণের বক্ষপিঞ্জরেই শৃঙ্খলিত থাকিতে হইবে। বুক ভাঙ্গিয়া তাহার একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল।

রাত্রে সরযূকে যে-ঘরে শয়ন করিতে দেওয়া হইল, সে ঘরের বিপুলা-য়তন রূপ মানুষের মনকে আতঙ্কিত করে। প্রকাণ্ড ঘরটার একপাশে একটা বহু পুরাতন পর্যঙ্কে তাহার শয্যা পাতা। দুই একটা কাঠের চেয়ার ও একটা মর্মর বেদী ছাড়া ঘরটায় আর কোন আসবাব নাই। স্বামী তখনো আসেন নাই। সরযূ একটা চেয়ারে বসিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। একটা ছোট ননদও নাই বাড়িতে যে তাহার কাছে এই সময়টা একটু বসিয়া গল্প করে। একটা ঝি আছে, কিন্তু সে দূরে কোথায় বসিয়া আছে, হয়ত ঘুমে ঢুলিতেছে। সরযূ তাহাকে ডাকিতে লজ্জা বোধ করিল। সে উঠিয়া একটা জানালা খুলিয়া দিল। অন্তঃপুরের পশ্চাতে সুবৃহৎ পুষ্করিণী এবং তৎসংলগ্ন বাগান। রাত্রের তরল অন্ধকারে সে বাগান যেন অরণ্যের মত মনে হইতেছে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকিতেছে—সরযূ এ-ডাক পূর্বে শোনে নাই। তাহার কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল।

তাহার মনে হইতে লাগিল, সে যেন বিশাল অরণ্যমধ্যস্থ রাজপুরীতে বন্দিনী রাজকুমারী; কোন যাদুকর যেন তাহার সমস্ত রাজ্যকে মন্ত্র-বলে পাষাণে পরিণত করিয়া তাহাকেই রাখিয়াছে মানবী মূর্তিতে। কবে কোন রাজপুত্র আসিয়া সেই পাষাণ রাজধানী আবার জনকোলাহলে মুখর করিয়া তুলিবে—অরণ্যের ভীষণতা প্রাসাদের মহিমায় বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। ভাবিতে সরযূর খুব মন্দ লাগিল না; নিস্তব্ধ কক্ষে বাতায়ন পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কত কথাই সে ভাবিতে লাগিল।

কিন্তু এরূপ নিস্তব্ধতার মধ্যে মানুষ কতক্ষণ অবস্থান করিতে

পারে? সরযূর ক্লান্তিবোধ হইতে লাগিল। স্বামীর উপর একটু রাগও যে না হইতেছিল তাহা নয়। নবপরিণীতা বধূকে এমনভাবে একা রাখিয়া যে স্বামী বাহিরে থাকিতে পারে, তাহার সহিত সমস্ত জীবনটা কাটান বড় সোজা নয়—নিশ্চয়ই?

পশ্চাতে দরজা খোলার শব্দে সরযূ চমকিয়া চাহিয়া দেখিল অরুণ। আনন্দে তাহার মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিল। উচ্ছ্বসিত হইয়া সে স্বামীর কাছে আসিয়া বলিল—কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

অরুণ তাহাকে আদর করিয়া বলিল, খুব রাত হয়ে গেছে, না? তোমার ভয় ক'রছিল?—

—না—খুব ভালই লাগছিল—শুধু একা, তাই—

—ভয় ক'রেনি তো? খুব সাহস তো তোমার?

হ্যাঁ, কিন্তু কোথায় ছিলে তুমি? বলো!

বাইরের ঘরে বসেছিলুম। রোজ সেখানে গানবাজনার আসর বসে কি না—আমি তো বাড়িতে থাকি না, যখন থাকি, একটু না গেলে সবাই ক্ষুণ্ণ হয়।

সরযূ আর কিছু বলিল না। অরুণ তাহাকে টানিয়া লইয়া জানালার কাছে দাঁড়াইল। এতক্ষণে চাঁদ উঠিয়াছে, পুকুরের কালো জলের ছোট ছোট ঢেউগুলিতে চন্দ্রবিম্ব নাচিয়া নাচিয়া খেলা করিতেছে। ওপারে আম বাগানের বৃহৎ বৃক্ষের ফাঁকে ফাঁকে চন্দ্রালোক পড়িয়া সমস্ত বাগান যেন স্বপ্নদৃষ্ট মায়ালোকের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে।

অরুণ সেইদিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, জানো সরযূ এই আমবাগান আমার ঠাকুরদার হাতের তৈরী। ঠাকুরদাই এ বাড়ী-ঘর সব করেছিলেন কি না! তাঁরই নক্সা অনুযায়ী এই বাড়ী। তুমি এখনো সবটা দেখনি বোধ হয়,—না?

সরযূ জানাইল যে, সে দেখে নাই। অরুণ বলিয়া চলিল, পশ্চিম-দিকের যে ঘরগুলো ধ্বসে পড়েছে, ঐগুলোই ছিল ঠাকুরদার ধনাগার সে ধন কি অল্প সল্প! শুনেছি, সাত শো পিতলের কলসীতে সেই

বিপুল ধনরাশি স্বর্ণমুদ্রাকারে রক্ষিত ছিল। ঠাকুরদা কাউকে সে টাকার একটিও ছুঁতে দিতেন না। তিনি নাকি শেষটায় সেই টাকা-গুলো ভালভাবে রাখার জন্য ঐ পশ্চিমদিকের কোন্ একটা কুঠরীতে রেখে একজন যক্ষকে তার রক্ষক নিযুক্ত করেন; সেই নাকি এখনো সেই টাকাগুলোকে পাহারা দেয়।

যক্ষের কথা শুনে সরযূর কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল; কিন্তু জানিবার আগ্রহও তাহার কম নয়। তাই সে অরুণের আরো কাছে সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—যক্ষ কি ভূত?

—না, হ্যাঁ, ভূতই বলা যায়। শুনেছি একটা ঘরে সমস্ত টাকাগুলো কলসীতে কলসীতে সাজিয়ে রেখে, একটি ছোট ছেলেকে নতুন কাপড় পরিয়ে, চন্দন, তিলক দিয়ে সাজিযে সেই ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালাবন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। ছেলেটিকে ঘরে রাখবার সময় যে খাবার ইত্যাদি দেওয়া হয়, তাতে যে কদিন চলে—চলে। তারপর ছেলেটি মরে ভূত হয়ে সেই ঘরে থাকে আর টাকাগুলোকে পাহারা দেয়।

স্বামীর মুখে এই গল্প শুনিতে শুনিতে বারংবার সরযূর বুক কাঁপিয়া উঠিতেছিল, তবুও তাহাকে যেন সেকথা শুনিতে হইবে। সে এবার চীৎকার করিয়া উঠিল—মাগো, না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরবে!

অরুণ তাহাকে বাকী গল্পটা হয়ত বলিত না, কিন্তু সরযূ তাকে খোঁচাইয়া, আব্দার করিয়া সবটা শুনিল এবং আরও শুনিল যে, তাহাদের সেই ঠাকুরদা এই বংশের পরবর্তী কোন পুরুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন। তাহার পূর্বে কেহই ওই ধনরাশি স্বায়ত্তে আনিতে পারিবে না। কারণ সেই মৃত ছেলেটি এখন যক্ষ হইয়া ধনভাণ্ডার পাহারা দিতেছে। অরুণের পিতা একবার সেই গুপ্তধন উদ্ধার করিবার চেষ্টা করায় সেই যক্ষ নাকি ক্রমাগত কয়েকদিন ঝড়বৃষ্টি ইত্যাদির সৃষ্টি করিয়া অট্টালিকার পশ্চিমাংশকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়া দিয়াছে। তদবধি ভয়ে আর কেহ কোন চেষ্টা করে নাই।

সারাদিন খাটুনিই গিয়াছে!

স্নান সারিয়া হাতমুখ ভাল করিয়া মুছিয়া শৈল এবার একটা ফরসা কাপড় পরিবে, পরিয়া বাঁচিবে! আঃ! এত কি আর একলা পারা যায়! যত রাজ্যের খবরের কাগজ, মাসিকপত্র, নবপ্রকাশিত কবিতার বই, উপন্যাস, নাটক, কত কি? তার সঙ্গে আবার বন্ধুদের অর্ধভুক্ত সিগারেট, বিড়ি, কি যে নাই—ভাবা যায় না!

সবই আজ সে পরিষ্কার করিয়াছে! মাগো কি ঘেন্না! ঐ সব যত লোকের এঁটো সিগারেট-বিড়িগুলো হাত দিয়ে সরাইয়া আবার স্নান না করিয়া থাকা যায়! হোক না শীতের বিকাল, ঐ সব আবর্জনা পরিষ্কার করিয়া স্নান না করিলে কি আর রাত্রে ঘুম হইবে!

না, আর একবার ঘাড়ে-পিঠে সাবানটা বুলাইয়া লওয়া যাক, যা ধুলা আজ সারাদিনটা চোখেমুখে ঢুকেছে! আর একটু বেশী জল গায়ে দিতে হবে।

কিন্তু বাড়ি আসিয়া আজ টের পাইবেন এখন! ঘরের চাবি তো কোন কালেই দেওয়া হয় না—আজ কিন্তু বেশ মজাটা দেখিবেন। কেমন জব্দ! শৈল পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, চাবি খুলিয়া ঠাকুরমার আচার চুরি করা কত ছোটবেলা হইতে অভ্যাস, তাহাকে কি না চার আনার একটা তালার ভয় দেখান! শৈলর হাসিই পাইল! আনন্দে আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে লাগিল সে!

নিরঞ্জন ভোরবেলা কোন এক শহরতলীতে গিয়াছে, সেখানে তাঁহার ও তাঁহার বন্ধুদের সাহিত্যবাসর না কি-এক মাথামুণ্ডু আছে; শৈল আজ তাই সুযোগ পাইয়াছে স্বামীর পড়ার ঘরটা পরিষ্কার করিববার। কতকালের আবর্জনা যে ঐ ঘরে জমা ছিল—মাগো মা, মানুষের একটু ঘেন্নাও করে না।

তাই কি শৈল বড় সহজে পারিয়াছে! নিরঞ্জন তাঁহার পড়ার ঘরে শৈলকে ঝাঁটা ঢুকাইতে দেয় না; তাহার ভয়. কত টুকরা কাগজপত্র আছে, কত বিষম দরকারী বই আলমারীর তলায় হয়ত তিন ভাঁজ হইয়া পড়িয়া আছে। শৈল সে-সব চিনিবে কেমন করিয়া! সবই ঝাঁটাইয়া বিদায় করিয়া দিবে। তার চেয়ে ঘর পরিষ্কারের দরকার নাই।

শৈল কত বার বলিয়াছে—তুমি একটু বাইরে দাঁড়িয়ে দেখ লক্ষ্মীটি, আমি তোমার সমুখেই ঝাঁট দিয়ে দিই। কিন্তু নিরঞ্জনের সময় কোথায়! শৈল ঝাঁট দিবে আর নিরঞ্জন দেখবে—এত বেশী ধৈর্য থাকিলে তো নিরঞ্জন জীবনে অনেক কিছুই করিতে পারিত। রবিবার একটু সময় অবশ্য পাওয়া যায়, কিন্তু ছয় দিন পর ঐ এক দিনের ছুটিটাকে নিরঞ্জন মাটি করিবে শৈলকে ঘর ঝাঁট দেওয়াইয়া। না, এত নিষ্ঠুর নয় নিরঞ্জন।

কিন্তু শৈলর সহ্য হয় না। মনে পড়ে তাহার উন্মুক্ত পল্লীর কোলে গোবর-নিকানো মেটেঘর—চারিদিক্ রোদে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে, কোথাও এতটুকু আবর্জনা নাই। প্রকাণ্ড উঠানটায় একটি কণাকড়ি পড়িয়া থাকিলে গোবরের শ্যামাভ রঙে তাহা সুন্দর শ্বেতকলঙ্কের সৃষ্টি করে! একটি ছোট্ট চড়াইপাখী আসিলেও নজর এড়াইয়া যায় না। আর এই বিশাল শহরের বিরাট অট্টালিকার ভীড়ে এঁদো গলির মধ্যে দোতলার দুটি কুঠরী। তাও একটাতে তো বই আর বই, বন্ধু আর বিড়ি-পোড়া, আর একটায় গোটাচারেক ট্রাঙ্ক ও দুখান দেওয়াল-আলমারীর মাঝে কোন রকমে তাহাদের শয্যাখানি পাতা। বাব্বা! শৈলর প্রাণ হাঁফাইয়া ওঠে। কিন্তু উপাই নাই। নিরঞ্জন শতাব্দীকাল ঐ বই, বন্ধু ও বিড়ি-পোড়া লইয়া থাকিবে, তবু শৈলকে ও-ঘরে ঢুকিতে দিবে না। আজ সেই নিরঞ্জন টেরটা পাইবে এখন।

বেশবাশ করিয়া শৈল জানালায় আসিয়া দাঁড়াইল। সখী পূর্ণিমা অনেকক্ষণ পূর্বেই ওদিকের বাড়ির জানালাটাতে বসিয়া আছে। হাসিয়া বলিল, "আজ এত দেরি কেন ভাই?"

শৈল সালঙ্কারে সখীকে ব্যাপারটা বলিতে লাগিল। বন্ধু ও বিড়ির জ্বালায় দু-জনেই যে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে, ইহাতে দু-জনেই সমান আনন্দিত হইল। শেষটায় শৈল বলিল যে, পূর্ণিমার স্বামী তবু অনেক ভাল, ঘর নোংরা করে না, বন্ধুদের জন্য দিনে অন্ততঃ পঁচিশ বার পূর্ণিমাকে চা করিতে হয় না এবং পূর্ণিমার স্বামীর পড়িবার ঘরের বালাই নাই।

পূর্ণিমা কিন্তু ইহাতে খুশি না-হইয়া বলিল, "না ভাই, পুরুষমানুষ, একটু পড়াশুনো করবে বই কি ; তাছাড়া তোমার স্বামী ভাই বিদ্বান্ মানুষ। রোজই তো তাঁর নাম কাগজে দেখি। ও রকম লোকের বৌ হওয়া কিন্তু ভাই ভাগ্যির কথা।"

শৈল একটু হাসিল। তাহার স্বামী তাহার গর্বের বস্তু—নিশ্চয়ই। বাংলা-সাহিত্যের তিনি প্রতিষ্ঠাপন্ন কবি, সাহিত্যিক। তাঁহার নাম না-শুনিয়াছে, তাঁহার গল্প না-পড়িয়াছে, এমন মেয়ে একটাও শৈল দেখে নাই। এই তো পূজার পূর্বে যখন তাহারা দেওঘর যাইতেছিল, গাড়িতে কি ভীড়! মেয়ে-কামরায় একটুও জায়গা নাই। কোনরকমে নিরঞ্জন শৈলকে কামরার মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। শৈল বসিবার জায়গাই পায় না, এমন সময় গাড়ির এক কোণ হইতে একটি তরুণী আসিয়া শৈলকে বিনীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"কিছু যদি মনে না করেন—একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।"

শৈল বলিল, "না, মনে কি করব—বলুন?"

—উনি কি নিরঞ্জনবাবু—কবি নিরঞ্জন চক্রবর্তী?

—হ্যাঁ।

—আপনার? স্বামী! কেমন?

হ্যাঁ।

আর যায় কোথা! শৈল যেন গাড়ির মধ্যে একটা মহা সম্মানের পাত্রী হইয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ একটা বেঞ্চির মাঝখানে তাহার জন্য জায়গা হইয়া গেল। সকলেই নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল।

নিরঞ্জনবাবু কি খাইতে ভালবাসেন, কখন লেখেন, কখন ঘুমান, দিনে কয়টা সিগারেট তাঁহার লাগে, ইত্যাদি অসংখ্য প্রশ্নে সকলে তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছেন। কি তাহাদের সৌজন্য, কি শ্রদ্ধা! সেদিনও শৈল সেই পঁচিশ-ত্রিশটি মেয়ের মধ্যে এমন একজনও দেখে নাই যে নিরঞ্জনের গল্প না-পড়িয়াছে।

পূর্ণিমা ঠিকই তো বলিতেছে। শৈলর মত স্বামী কয়জন নারীর ভাগ্যে মিলে। কিন্তু কোথায় যেন শৈলর বাধিতেছিল! কি যেন একটা ব্যাথা তাহাকে ম্রিয়মাণ করিয়া দিল।

অকস্মাৎ সে সন্ধ্যা-প্রদীপ দিবার ছল করিয়া পূর্ণিমার কাছে বিদায় লইয়া চলিয়া আসিল। সন্ধ্যার তখনও সময় হয় নাই। শৈল আসিয়া এদিকের বারান্দায় দাঁড়াইল। আকাশের এক প্রান্ত দেখা যায়। পশ্চিমাকাশ লাল হইয়া উঠিয়াছে, দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর। এমনি সময় তাহাদের গ্রামে গাঙুটি পালের গরু বাড়ি ফেরে। শৈল এতক্ষণ খড় কাটিয়া, খৈল মাখাইয়া মঙ্গলী গাইটার জন্য খাবার তৈরী করিয়া রাখিত। মঙ্গলী গাইটার বাছুর হইয়াছে, মা লিখিয়াছেন; কতটা দুধ দিতেছে কে জানে। শৈল থাকিলে তাহার যে রকম যত্ন হইত, তাহা কে জানে কি হইবে!

ও-দিকে ছাদটার আলিসায় সেই ঝাঁকড়া চুল ছেলেটা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। শৈল মুখ ফিরাইল! কি যে অদ্ভুত এই সব ছেলের দল। শৈলর গা জ্বালা করে। শৈল ঘরে ঢুকিয়া সন্ধ্যা-প্রদীপ সাজাইল। দীপ জ্বালাইয়া শঙ্খধ্বনি করিয়া ঘরের দেওয়ালে টাঙান দেবমূর্তির পায়ে প্রণাম করিল।

এইবার? এইবার সে করিবে কি? নিরঞ্জন বলিয়া গিয়াছে, ফিরিতে রাত্রি এগারোটার কম নয়। এই সন্ধ্যা হইতে রান্না চড়াইলে সবই যে ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে, তার উপর শীতের রাত্রি। রান্না একটু দেরী করিয়াই চড়াইবে শৈল। কিন্তু ততক্ষণ যে প্রচুর অবসর, তাহা সে ভরাইয়া রাখিবে কি দিয়া? পূর্ণিমা ত রান্নাঘরে ঢুকিয়াছে—

সকলেই ঢুকিয়াছে। শৈলও অন্যদিন এতক্ষণ উনানশালে বসিয়া রান্না করে। কিন্তু আজ যে তাহার সময় আর ফুরাইতে চাহিতেছে না। অবশ্য, দিনের বেলা এত বেশী কাজ সে করিয়াছে যে রান্নার সুবিধা হয় নাই। ঘরের সঞ্চিত চিঁড়া ভিজাইয়া খাইয়াছে। এবেলা ভাত না খাইলে অস্বস্তি বোধ করিবে সে। কিন্তু নিজের সুবিধার জন্য এত আগে শৈল রান্না করিলে, নিরঞ্জন যে সে-ভাত মুখে তুলিতেই পারিবে না। না কাজ নাই। শৈল আর একবার আসিয়া নিরঞ্জনের পড়ার ঘরে ঢুকিল, সুইচ টিপিতেই ঘরখানি যেন হাসিয়া উঠিল। চারিদিকে নানা রকম বই, সবগুলি আজ সে ঝাড়িয়া মুছিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছে। কত রঙের সুন্দর সুন্দর মলাট, কত ছবি, কি যে আছে উহাদের মধ্যে! ইহারা তাহার স্বামীর নিত্যকার সঙ্গী। নিরঞ্জনের কাছে ইহারা শৈলর অপেক্ষা প্রিয়; কিন্তু নিরঞ্জনের সেই স্নেহ বাহ্যতঃ ইহাদের উপর প্রকাশ পায় না। ধূলায় ইহাদের অঙ্গ ভরিয়া উঠে, মলাটের পাতা খসিয়া যায়, পাতা ছিঁড়িয়া পড়ে, ইহারা করুণ দৃষ্টিতে শৈলর মুখপানে যেন চাহিয়া থাকে একটু আদর পাইবার জন্য, একটু মাতৃস্নেহ পাইবার অপেক্ষায়। কত বিদেশী-বইয়ের শক্ত মলাট খুলিয়া গিয়াছে, কত দেশী বইয়ের পাতা বিড়ির আগুনে পুড়িয়াছে, কত বৃহদাকার মাসিক পত্রগুলি দুমড়াইয়া গিয়াছে—শৈল দেখে আর নীরব সহানুভূতিতে তাহার অন্তর ভরিয়া যায়। তথাপি সে কোন দিন ইহাদের একটু আদর করিতে পারে না।—একটু ছুঁইতে পারে না। এমনি নির্মম শাসন নিরঞ্জনের।

হ্যাঁ, আজ শৈল একটা কাজের মত কাজ করিয়াছে। তাহার স্বামীর প্রিয় সঙ্গীগুলিকে স্নেহ দিয়া, ভালোবাসা দিয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছে। আনন্দে উহারা যেন খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছে। কে উহারা, কেমন উহারা, শৈল চেনে না, কেন যে নিরঞ্জন উহাদিগকে এত ভালোবাসে তাহাও শৈল বোঝে না—

শৈল শুধু জানে ঐ বইগুলি নিরঞ্জনের অত্যন্ত প্রিয়। প্রিয়, কিন্তু

নিরঞ্জন উহাদের যত্ন করিতে জানে না। সে শুধুই দু-চোখের অগাধ তৃষ্ণা দিয়া উহাদের রস শুষিয়া লয়, হৃদয় ভরিয়া তাহা পান করে, তাহার পর বন্ধুদের সঙ্গে বিড়ি টানিয়া উহাদের কথা লইয়া মাতামাতি করে; কিন্তু আশ্চর্য। উহাদের পার্থিব দেহের যত্নও যে করা উচিত নিরঞ্জন মনে করে না। পুরুষ মানুষ এমনই হয়। স্বার্থপর!

ঘড়িটায় আটটা ঘা পড়িল। না, আর বসিয়া থাকা ভাল নয়, রান্না করিতে হইবে। শৈল উঠিল। বেশী কি আর রান্না; ডাল ভাত তরকারি। শৈল তাহাই আস্তে আস্তে রাঁধিতে লাগিল। দশটা ঘা ঘড়িতে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই রান্না তাহার শেষ হইয়া গেল। এখনও যে অনেকক্ষণ দেরী খাবার যাহাতে ঠাণ্ডা হইয়া না যায়, শৈল তাহার জন্য জল গরম করিয়া খাবার বসাইয়া রাখিল। আসনটা তুলিয়া পাতিল, বিছানাটা একটু ঝাড়িয়া আসিল;—না, সময় আর কাটে না। কি সে করিবে!

পূর্ণিমা কিন্তু বেশ। হাতে কাজ না থাকিলে গল্পের বই পড়ে, সে বই আবার শৈলর কাছেই চাহিয়া লয়। রাত্রে পড়িবার জন্য নিরঞ্জন মাথার বালিসের নীচে যে দু-একখানা টাটকা মাসিকপত্র রাখে, শৈল তাহাই সখীকে পড়িতে দেয়, না হইলে নিরঞ্জনের পড়িবার ঘরে তো তার প্রবেশ নিষেধ! শৈলর দেওয়া বইয়ের গল্প পড়িয়া কখনও কখনও পূর্ণিমা কাঁদিয়া ফেলে, বলে, তোমার স্বামীর লেখা গল্পটা পড়লুম ভাই আর কি সুন্দর, কি করুণ! আবার কখনও বা হাসিয়া লুটাইয়া পড়ে, বলে—"প'ড়ে দেখো ভাই, কি মজার গল্প! হেসে তো আমার পেটের নাড়ী উল্টে আসছে—"

শৈল একটু হাসে, একটু করুণ হাসি। পূর্ণিমা কিছু বুঝিতে পারে না। আপনার মনে বলিয়া চলে—কি সুন্দর লেখেন ভাই তোমার উনি। যেটা পড়ি সেইটেতেই ভাবি, যেন ঠিক আমার কথাটাই লিখেছেন। কি ক'রে লেখেন ভাই! শৈল আবার হাসে, তেমনি ম্লান হাসি! পূর্ণিমা বলে, আচ্ছা ভাই শৈ, এই যে সেদিন গল্পটা

পড়লুম "রাতের বিরহ" সে তো দেখি তোমাকে নিয়ে লেখা—তোমাকে এমন সুন্দর ক'রে এঁকেছেন তাতে, তুমি পড়েছ নিশ্চয় গল্পটি ?

শৈল নীরবে তেমনি হাসে।

চতুর্দিকে তাহার স্বামীর স্তবগান। পাড়ার তরুণীরা তাহার কাছে সরাসরি আসিয়া বলে—আপনার স্বামীর দু-একটা লেখা ছাপার আগে দেখাতে পারেন না ? দেখান না একটু ? শৈল মৃদু হাসিয়া বলে,—ছাপা হলেই পড়বেন ভাই, তার আগে পড়লে ছাপা বইগুলো বিকোবে কি ক'রে ?

শৈলের উত্তর খুবই সমীচীন। কেহই আর কথা কয়না। কিছুক্ষণ পরে একজন বলে—আচ্ছা শৈলদি, আপনি নিশ্চই ছাপা হবার আগে গল্পগুলো পড়ে নেন ? অন্যজন বলে, তুই কি বোকা রে! শৈলদির প্রেরণাতেই তো গল্প লেখা হয়। কাজেই ধরে নিতে হবে ; নিরঞ্জনবাবু নিজেই ওঁকে পড়ে শোনান নতুন লেখা। না শৈলদি ?

শৈল আবার হাসে, কোন জবাব দেয় না।

ঘড়িতে এগার ঘা বাজিল। এবার তাহা হইলে আসিতেছেন। উঃ! কি দীর্ঘ প্রতীক্ষা। ওই যে!

শৈল দরজা খুলিয়া দিলে নিরঞ্জন ঘরে ঢুকিল। গলায় তাহার পুষ্পমাল্য, কপালে চন্দনলেখা, হাতে রৌপ্যপেটিকা।

শৈল অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া নিরঞ্জন তাহাকে কাছে টানিয়া বলিল—চিনতে পারছ না নাকি ?

শৈল্য কৌতুক-হাস্যে বলিল—বিয়ে ক'রে এলে বুঝি ? বৌ কই ?

নিজের গলার পুষ্পমাল্যটি তাহার গলায় পরাইতে পরাইতে নিরঞ্জন কহিল—এই যে!

আনন্দে শৈলর সর্বাঙ্গ শিহরিতে লাগিল। পরে উঠিয়া রৌপ্য-পেটিকাটি লইয়া সে ধীরে ধীরে নিরঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করিল—এটাতে কি আছে, খুলব ?

জামা খুলিতে খুলিতে নিরঞ্জন ব্যঙ্গহাস্যে বলিল—ও খুলে সুবিধে করতে পারবে না ; তপ্‌সে মাছ নয়। ওতে আছে মানপত্র।

—মানপত্র! সে আবার কি জিনিস?

—দরকার নেই জেনে। দাও, রেখে দিই—বলিয়া নিরঞ্জন তাহার হাত হইতে সেটা ছিনাইয়া লইল! শৈলর অন্তর ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইতেছিল—সে অতিকষ্টে চাপিয়া গেল। না, দুঃখ করিয়া আজ আর কোন ফল নাই। জামাটা খুলিয়া টাঙাইয়া রাখিয়া নিরঞ্জন গিয়া তাহার পড়ার ঘরের দরজা খুলিবার জন্য তালাতে চাবি লাগাইল। আশায় ও আনন্দে শৈলর বুকের ভিতর ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করিতে লাগিল। আর আধ মিনিট পরেই নিরঞ্জন দেখিবে, দেখিয়া বিস্মিত, মুগ্ধ হইয়া যাইবে। তাহার আদরের বইগুলি কত যত্নে সাজিয়া-গুজিয়া তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছে, ঠিক প্রতি বৈকালের শৈলর মতই।

নিরঞ্জন চাবি খুলিয়া সুইচ টিপিল। মুহূর্তে ঘর হাসিয়া উঠিল তাহার চোখের উপর। সুন্দরী! সারা অঙ্গে যেন তাহার বসন্তের শোভা জাগিয়াছে। নিরঞ্জন সত্যই মুগ্ধ হইল, কিন্তু—

নিরঞ্জন ছুটিয়া শেল্‌ফটার কাছে গেল। তার পরই আসিয়া দাঁড়াইল টেবিলটার কাছে। ড্রয়ার টানিল, টেবিলের উপরকার ব্লটিং প্যাড্‌টা তুলিয়া দেখিল, তার পর চেঁচাইয়া উঠিল—আমার সেই কানফোঁড়া কাগজগুলো কই—শৈল! কোথায় রেখেছ?

—কোন্ কাগজ! শৈল ভীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল।

—লালচে রঙের কাগজ—কোণায় পিন দিয়ে আটকানো?

—পিন দিয়ে আটকানো? সে রকম কাগজ তো ছিল না!

সেকি শৈল! সর্বনাশ করেছ। কেন তুমি ঘর গোছাতে এলে শৈল, কেন আমার এমন সর্বনাশ করলে?

নিরঞ্জনের সমস্ত মুখ রাগে দুঃখে ফুলিয়া উঠিল। মুহূর্তে সে ঘরের সমস্ত বইখাতা ওলটপালট করিয়া টানিয়া ছুঁড়িয়া মেঝেতে ফেলিয়া

তাহার সেই কোণায় পিন আটকানো কাগজ খুঁজিতে লাগিল। পনর মিনিটেই ঘরখানা বই আর কাগজের স্তূপে একাকার হইয়া গেল। শৈল সব দেখিয়া একেবারে কাঠ হইয়া গিয়াছে। কোথাও না পাইয়া নিরঞ্জন বলিল.—কোথায় ফেলেছ ময়লাগুলো বল, শীঘ্রি বল শৈল—খুঁজে দেখি। বাইরে ফেলে দিয়েছ কি?

শৈলর নিকট হইতে কোন উত্তর আসিল না। নিরঞ্জন ধমক দিয়ে বলিল—ন্যাকামি রাখ—কোথায় ফেলেছ?

—ঝি বাসন ধুতে এলে তাকে দিয়ে বাইরে সব ছেঁড়া কাগজ ফেলে দিয়েছি—অতিশয় ভীতকণ্ঠে শৈল উত্তর দিল।

—কখন?

—বৈকালে! শৈলর গলা প্রায় বন্ধ হইয়া আসিতেছিল।

নিরঞ্জন এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করিয়া ছুটিল বাহিরে। শৈল নির্বাক হইয়া থাম ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দশ মিনিট, পনর মিনিট, আধ ঘণ্টা—নিরঞ্জন ফিরিল।—নাঃ ওকি আর পাওয়া যায়? ছিঃ ছিঃ! কে তোমাকে আমার ঘর পরিষ্কার করতে বলল? কেন তুমি গেলে ও ঘরে? বল, উত্তর দাও। তুমি জান না, কোনটা কাজের আর কোন্‌টা বাজে, তোমার এত সদ্দারী করতে যাওয়া কেন?

গর্জন করিয়া বলিল. দাঁড়িয়ে কেন? যাও—আমার আর খাওয়া-দাওয়ার দরকার নেই—যাও শোও গে। ওঃ এত কষ্টে লেখা—গায়ের রক্ত জল করে লেখা নাটকখানা নষ্ট হয়ে গেল। ওর আর কোথাও কপি নাই যে উদ্ধার হবে। হায় হায়—নিরঞ্জন সত্যই কাঁদিয়া ফেলিল। মনে পড়িল, কত রাত্রি সে জাগিয়া কাটাইয়াছে ঐ নাটকটি লিখিবার জন্য। শৈল ঘুমাইলে অন্তত দুই ঘণ্টা সে জাগিয়াছে। দিনের বেলা সময় বেশী পায় না সে, তাই রাত্রিতেই তাহাকে লিখিতে হয়। নাটকটি তাহার সমস্ত সাহিত্যিক বন্ধুই প্রশংসা করিয়াছে। শেষ হইলে উহা হয়তো নিরঞ্জনের আর একটা গৌরবের জয়মাল্য আনিতে পারিত! দুঃখে নিরঞ্জনের মস্তিষ্কের ঠিক ছিল না; প্রস্তরবৎ দণ্ডায়মানা শৈলকে

একটা জোরে ঠেলা দিয়া শোবার ঘরে ঢুকাইয়া দিতে দিতে সে বলিল যাও, তোমার মুখ দেখলে রাগ সামলাতে পারছি না! নিরঞ্জন বাহিরে আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিল!

তাহার ভাগ্যই এইরূপ; নতুবা এই বিংশ শতাব্দীতে কাহার ভাগ্যে এমন হয় যে, নিজের স্ত্রী স্বামীর বহু যত্নে লিখিত পাণ্ডুলিপি ডাস্টবিনে ফেলিয়া দেয়! দুঃখ করিয়া লাভ নেই—কপালে যাহা লেখা আছে তাহাই তো ঘটিবে।

কিন্তু মন যে মানিতে চাহে না। অমন সুন্দর নাটকটা! একটা ছেলে মরিয়া গেলে কত দুঃখ হয় নিরঞ্জন জানে না, কিন্তু সে জানে যে নিজের লেখা বইয়ের একমাত্র পাণ্ডুলিপি হারাইয়া যাওয়ার শোক অপেক্ষা পুত্রশোক বেশী নয়। তাহার দুই চোখ ভরিয়া আবার জল আসিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ—অনেকক্ষণ ভাবিয়া সে একটু প্রকৃতিস্থ হইতেই মনে পড়িল, শৈলকে সে খুব বেশী তিরস্কার করিয়াছে। এতটা কেন করিল! যাহা হইবার হইয়াছে, অনর্থক আর—কিন্তু নিরঞ্জন ভুলিতে পারিতেছে না যে, এ-যুগে শৈল ছাড়া আর কোন মেয়েই এমনটা করিত না। নিজের অদৃষ্টের জন্য নিরঞ্জন আর কখনও এত বেশী ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বুকের ভিতরটা তাহার মুচড়াইয়া উঠিল।

কিন্তু উপায় নাই। নিরঞ্জন ধীরে ধীরে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। রাত্রি তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। নিরঞ্জন একবার চাহিয়া দেখিল, শৈল খাটের পায়া ধরিয়া পাথরের মূর্তির মতই দাঁড়াইয়া আছে; মুখ তাহার অন্য দিকে থাকায় দেখিতে পাইল না, দেখিবার ইচ্ছাও ছিল না। শৈলকে দেখিলে আজ তাহার রাগই বাড়িয়া যাইতেছে। নিরঞ্জন পাশ ফিরিয়া শুইল। কোন সহানুভূতিই সে দেখাইবে না! যাহার যেমন কর্ম, সে তেমন ফল ভোগ করুক। থাকুক শৈল দাঁড়াইয়া। নিরঞ্জন চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল!

*　　*　　*　　*

সকালে ঠাণ্ডা হাত গায়ে লাগিতেই ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চোখ খুলিয়াই নিরঞ্জন দেখিল, হাতে চা এবং কোণে সুতা বাঁধা একটা খাতা বুকের উপর চাপিয়া সে দাঁড়াইয়া আছে।

নিরঞ্জন গত রাত্রে যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছে। সারা গায়ে তাহার ব্যাথা। চায়ের কাপটা লইয়া প্রথমেই সে দুই চুমুক খাইয়া ফেলিল।

শৈল খাতাটা তাহার চোখের সুমুখে ধরিয়া বলিল, দেখ দেখি, এইটা নয়?

উৎকণ্ঠায় উদ্বেগে শৈলর মুখখানি করুণ দেখাইতেছে। যেন নিরঞ্জনের উত্তরের উপর তাহার জীবন-মরণ নির্ভর করে। নিরঞ্জন তাহার মুখের পানে চাহিল, কি নিদারুণ বেদনা ও ক্লান্তিতে সে-মুখ ছাইয়া গিয়াছে! সন্তানহারা জননীর ব্যাথা কি এমনই, না ইহার চেয়েও বেশী?

নিরঞ্জন বলিতে পারিল না যে, ইহা তাহাদের ক্লাবের খুচরা হিসাবের খাতা। সে হাসি মুখে বলিল, হ্যাঁ, এই তো, আমি ঘুমুলে খুঁজে পেয়েছ বুঝি?

আনন্দে শৈলর দুটি চোখে অশ্রু উথলিয়া পড়িল।

———

সরযূকে আজ দেখিতে আসিবে।

মা সকাল হইতে তাড়া দিতেছেন গা-হাত ধুইবার জন্য। ভালরূপ সাজিয়া-গুজিয়া না দেখাইলে পোড়ার মুখ লোকের কি আর পছন্দ হয়! যদিও সরযূর চেহারা পাড়ার অন্য পাঁচটা মেয়ে অপেক্ষা ভালই এবং স্বাস্থ্যও তাহার দেখিবার মত, তথাপি মার সর্বদা ভয় হইতেছে, যদি তাহারা পছন্দ না করে!

পছন্দ করিবার জন্য মা-বাবা যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন এত দিন। বাবা কেরাণী হইয়াও বহু কষ্টার্জিত অর্থে তাহাকে ম্যাট্রিক পাশ করাইয়াছেন, সেলাই, বুনন শেখাইয়াছেন, গানও শেখাইবার ব্যবস্থার ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু গলা ভাল না থাকায় সরযূর গান শেখা হইল না। তাই তাহার বাবা আল্পনা ও চিত্রাঙ্কন কার্যে তাহাকে দক্ষ করিয়া তাহার কলানুরাগিতা প্রমাণের জন্য আজ সাত মাস হইতে এক আর্টিষ্ট টিচার পুষিতেছেন।

ওদিকে মায়ের যত্নেরও ত্রুটি নাই, তিনি চপ্‌, কাট্‌লেট, কালিয়া হইতে পোলাও, কোর্মা সবই মেয়েকে রাঁধিতে শিখাইয়াছেন। এই শিক্ষার ব্যয়নির্বাহ করিতে বাপকে কম কষ্টটা ভোগ করিতে হয় নাই, এবং প্রথম প্রথম সরযূর অপটু হাতের কদর্য রান্না খাইয়াও তাহাকে প্রশংসা করিয়া উৎসাহ দিতে হইয়াছে। সেই সরযূর সমস্ত শিক্ষার আজ পরীক্ষা।

বেলা তিনটা বাজিয়া গেল। চারটার সময় তাঁহারা আসিবেন। সরযূ যে এখনো ঘরের ভিতর বসিয়া আছে। আশ্চর্য! মা চীৎকার করিয়া বলিলেন—ও সরযূ, উঠে আয়না মা, আর আধঘণ্টার মধ্যে যে এসে পড়বে সব। আচ্ছা মেয়ে বাপু তোরা হয়েছিস।

সরযূ কোনদিন কারো কথায় প্রতিবাদ করে নাই, আজও করিল না। গা ধুইয়া পোষাকী কাপড়-চোপড় পরিয়া পটের ছবিতে সাজিয়া সে বসিয়া রহিল। মা তাহাকে পাড়ার পাঁচজনের নিকট হইতে চাহিয়া চিন্তিয়া যতগুলি গহনা পরাইয়া দিয়াছেন, সবই সরযূ নির্বিবাদে পরিয়া আছে। সকলেই বলিল—কী লক্ষ্মী মেয়ে! একে কি কেউ পছন্দ না করে পারে!

মেয়ে কিন্তু ভাবিতেছে—পছন্দ না করিলেই যেন সে বাঁচিয়া যায়। তাহার ষোড়শ বৎসরের মুক্ত কৌমার্যকে ইহারা কেন যে বিবাহের শৃঙ্খলে বাঁধিয়া ফেলিতে চাহিতেছে। তবুও সরযূ প্রতিবাদ করিল না। প্রতিবাদ করা তাহার স্বভাবে নাই।

কন্যা পছন্দ হইল এবং বিবাহ হইয়া গেল। যাহার সহিত বিবাহ হইল, সে মানুষটি নাকি কলেজে পড়িতেছে। সরযূ তখনো তাহাকে ভাল করিয়া দেখে নাই। আজই উহার সহিত গাঁটছড়া-বাঁধা অবস্থায় তাহাকে চিরপরিচিত কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতে হইবে পশ্চিমবঙ্গের কোন এক অখ্যাত পল্লীতে। সেইখানেই উহাদের পৈত্রিক ভিটা। সরযূর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। পাড়াগাঁয়ে সে কখনো যায় নাই—সেখানকার মশা-ম্যালেরিয়ার সঙ্গে ভূত শাঁকচুন্নির কথা সে পুস্তকে পড়িয়াছে, এবং পড়িয়া পড়িয়া তাহার মনে একটা বদ্ধমূল ধারনা জন্মিয়াছে যে, কাব্যে-উপন্যাসে পল্লীর অতি লোভনীয় চিত্র থাকিলেও মশা, ম্যালেরিয়ার সঙ্গে সাপ, বাঘ, শাঁকচুন্নির অভাব নাই। তবু তাহাকে সেখানে যাইতে হইবে। সরযূ এবারও কোন কথা বলিল না, নীরবে স্বামীর অনুগমন করিল।

স্টেশন হইতে ক্রোশখানেক পাল্কীতে আসিয়া পৌছিল শ্বশুর বাড়িতে। বিরাট এক প্রাসাদ—ইট, সুরকী খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে। পশ্চিমদিকের একটা প্রান্ত কবে কোন দুর্যোগ রজনীতে ধ্বসিয়া পড়িয়া বহু পুরাতন যুগের স্তূপের মত দেখাইতেছে।

অন্তঃপুর-সংলগ্ন বিশাল পুষ্করিণীর চতুষ্পার্শ্বে সুবিস্তৃত আম্রকানন পুরাকালের তপোবনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সয়যূ চাহিয়া চাহিয়া নির্বাক বিস্ময়ে সমস্ত দেখিল। দেখিয়া দেখিয়া মন তাহার আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িল। কিন্তু উপায় নাই—তাহাকে এই ক্ষুধিত পাষাণের বক্ষপিঞ্জরেই শৃঙ্খলিত থাকিতে হইবে। বুক ভাঙ্গিয়া তাহার একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল।

রাত্রে সরযূকে যে-ঘরে শয়ন করিতে দেওয়া হইল, সে ঘরের বিপুলা-য়তন রূপ মানুষের মনকে আতঙ্কিত করে। প্রকাণ্ড ঘরটার একপার্শ্বে একটা বহু পুরাতন পর্যঙ্কে তাহার শয্যা পাতা। দুই একটা কাঠের চেয়ার ও একটা মর্মর বেদী ছাড়া ঘরটায় আর কোন আসবাব নাই। স্বামী তখনো আসেন নাই। সরযূ একটা চেয়ারে বসিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। একটা ছোট ননদও নাই বাড়িতে যে তাহার কাছে এই সময়টা একটু বসিয়া গল্প করে। একটা ঝি আছে, কিন্তু সে দূরে কোথায় বসিয়া আছে, হয়ত ঘুমে ঢুলিতেছে। সরযূ তাহাকে ডাকিতে লজ্জা বোধ করিল। সে উঠিয়া একটা জানালা খুলিয়া দিল। অন্তঃপুরের পশ্চাতে সুবৃহৎ পুষ্করিণী এবং তৎসংলগ্ন বাগান। রাত্রের তরল অন্ধকারে সে বাগান যেন অরণ্যের মত মনে হইতেছে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকিতেছে—সরযূ এ-ডাক পূর্বে শোনে নাই। তাহার কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল।

তাহার মনে হইতে লাগিল, সে যেন বিশাল অরণ্যমধ্যস্থ রাজপুরীতে বন্দিনী রাজকুমারী; কোন যাদুকর যেন তাহার সমস্ত রাজ্যকে মন্ত্র-বলে পাষাণে পরিণত করিয়া তাহাকেই রাখিয়াছে মানবী মূর্তিতে। কবে কোন রাজপুত্র আসিয়া সেই পাষাণ রাজধানী আবার জনকোলাহলে মুখর করিয়া তুলিবে—অরণ্যের ভীষণতা প্রাসাদের মহিমায় বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। ভাবিতে সরযূর খুব মন্দ লাগিল না; নিস্তব্ধ কক্ষে বাতায়ন পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কত কথাই সে ভাবিতে লাগিল।

কিন্তু এরূপ নিস্তব্ধতার মধ্যে মানুষ কতক্ষণ অবস্থান করিতে

পারে ? সরযূর ক্লান্তিবোধ হইতে লাগিল। স্বামীর উপর একটু রাগও যে না হইতেছিল তাহা নয়। নবপরিণীতা বধূকে এমনভাবে একা রাখিয়া যে স্বামী বাহিরে থাকিতে পারে, তাহার সহিত সমস্ত জীবনটা কাটান বড় সোজা নয়—নিশ্চয়ই ?

পশ্চাতে দরজা খোলার শব্দে সরযূ চমকিয়া চাহিয়া দেখিল অরুণ। আনন্দে তাহার মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিল। উচ্ছ্বসিত হইয়া সে স্বামীর কাছে আসিয়া বলিল—কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?

অরুণ তাহাকে আদর করিয়া বলিল, খুব রাত হয়ে গেছে, না ? তোমার ভয় ক'রছিল ?—

—না—খুব ভালই লাগছিল—শুধু একা, তাই—

—ভয় ক'রেনি তো ? খুব সাহস তো তোমার ?

হ্যাঁ, কিন্তু কোথায় ছিলে তুমি ? বলো !

বাইরের ঘরে বসেছিলুম। রোজ সেখানে গানবাজনার আসর বসে কি না—আমি তো বাড়িতে থাকি না, যখন থাকি, একটু না গেলে সবাই ক্ষুণ্ণ হয়।

সরযূ আর কিছু বলিল না। অরুণ তাহাকে টানিয়া লইয়া জানালার কাছে দাঁড়াইল। এতক্ষণে চাঁদ উঠিয়াছে, পুকুরের কালো জলের ছোট ছোট ঢেউগুলিতে চন্দ্রবিম্ব নাচিয়া নাচিয়া খেলা করিতেছে। ওপারে আম বাগানের বৃহৎ বৃক্ষের ফাঁকে ফাঁকে চন্দ্রালোক পড়িয়া সমস্ত বাগান যেন স্বপ্নদৃষ্টি মায়ালোকের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে।

অরুণ সেইদিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, জানো সরযূ এই আমবাগান আমার ঠাকুরদার হাতের তৈরী। ঠাকুরদাই এ বাড়ী-ঘর সব করেছিলেন কি না! তাঁরই নক্সা অনুযায়ী এই বাড়ী। তুমি এখনো সবটা দেখনি বোধ হয়,—না ?

সরযূ জানাইল যে, সে দেখে নাই। অরুণ বলিয়া চলিল, পশ্চিম-দিকের যে ঘরগুলো ধ্বসে পড়েছে, ঐগুলোই ছিল ঠাকুরদার ধনাগার সে ধন কি অল্প সল্প! শুনেছি, সাত শো পিতলের কলসীতে সেই

বিপুল ধনরাশি স্বর্ণমুদ্রাকারে রক্ষিত ছিল। ঠাকুরদা কাউকে সে টাকার একটিও ছুঁতে দিতেন না। তিনি নাকি শেষটায় সেই টাকা-গুলো ভালভাবে রাখার জন্য ঐ পশ্চিমদিকের কোন্ একটা কুঠরীতে রেখে একজন যক্ষকে তার রক্ষক নিযুক্ত করেন; সেই নাকি এখনো সেই টাকাগুলোকে পাহারা দেয়।

যক্ষের কথা শুনে সরযূর কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল; কিন্তু জানিবার আগ্রহও তাহার কম নয়। তাই সে অরুণের আরো কাছে সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—যক্ষ কি ভূত?

—না, হ্যাঁ, ভূতই বলা যায়। শুনেছি একটা ঘরে সমস্ত টাকাগুলো কলসীতে কলসীতে সাজিয়ে রেখে, একটি ছোট ছেলেকে নতুন কাপড় পরিয়ে, চন্দন, তিলক দিয়ে সাজিযে সেই ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালাবন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। ছেলেটিকে ঘরে রাখবার সময় যে খাবার ইত্যাদি দেওয়া হয়, তাতে যে কদিন চলে—চলে। তারপর ছেলেটি মরে ভূত হয়ে সেই ঘরে থাকে আর টাকাগুলোকে পাহারা দেয়।

স্বামীর মুখে এই গল্প শুনিতে শুনিতে বারংবার সরযূর বুক কাঁপিয়া উঠিতেছিল, তবুও তাহাকে যেন সেকথা শুনিতে হইবে। সে এবার চীৎকার করিয়া উঠিল—মাগো, না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরবে!

অরুণ তাহাকে বাকী গল্পটা হয়ত বলিত না, কিন্তু সরযূ তাকে খোঁচাইয়া, আব্দার করিয়া সবটা শুনিল এবং আরও শুনিল যে, তাহাদের সেই ঠাকুরদা এই বংশের পরবর্তী কোন পুরুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন। তাহার পূর্বে কেহই ওই ধনরাশি স্বায়ত্তে আনিতে পারিবে না। কারণ সেই মৃত ছেলেটি এখন যক্ষ হইয়া ধনভাণ্ডার পাহারা দিতেছে। অরুণের পিতা একবার সেই গুপ্তধন উদ্ধার করিবার চেষ্টা করায় সেই যক্ষ নাকি ক্রমাগত কয়েকদিন ঝড়বৃষ্টি ইত্যাদির সৃষ্টি করিয়া অট্টালিকার পশ্চিমাংশকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়া দিয়াছে। তদবধি ভয়ে আর কেহ কোন চেষ্টা করে নাই।

সরযূ ভয়ে ভয়ে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, ঠাকুরদা কতদিন পরে জন্মাবেন ?

—তাতো কিছু তিনি বলেননি। তোমার ছেলে হয়েও জন্মাতে পারেন।

—আমার ছেলে হয়ে— !

সরযূ শিহরিয়া উঠিল। সেই নিষ্ঠুর লোক—যে ধনভাণ্ডারের রক্ষক নিযুক্ত করিবার জন্য পরের ছেলেকে না খাইতে দিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে, তাহার মা হইতে সরযূর কোথায় যেন বাঁধিতেছে ; না সরযূ তাহার মা হইতে চাহেন না। সরযূর গর্ভে যে জন্মিবে. সে যেন ঐরূপ নিষ্ঠুর না হয়। কিন্তু এত কথা সে স্বামীকে বলিতে পারে না। তাহার সহরের আবহাওয়ায় শিক্ষিত তরুণ মনে স্বামীর কাছে সব কিছু বলিবার মত প্রসারতা থাকিলেও সন্তানের কথা বলিবার মত জোর নাই। সরযূ চুপ হইয়া রহিল। অরুণ কিন্তু বলিযা চলিল—তা' হ'লে কিন্তু বেশ হয় সরযূ। বাবা অনেক দেনাপত্র করে ফেলেছেন, সেগুলো শোধ দিয়ে আর একবার চাটুজ্যে গোষ্ঠি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে।

সরযূ স্বামীর কথা শুনিয়া হাঁ বা না কিছুই বলিতে পারিল না। তাহার মনে তখন সেই যক্ষরূপী শিশুটি জাগিয়া উঠিয়াছে ; নারীর মধ্যে যে সুপ্ত মাতৃত্ব থাকে, তাহাই যেন সরযূর সমস্ত অন্তরকে নাড়া দিয়া কাঁদিয়া উঠিল,—যেন সরযূর আপন সন্তান অনাহারে কোথায় বন্দী।

সরযূ অরুণকে ধরিয়া বলিল—আমায় দেখাবে, কোন দিকে সেই ধনাগারগুলো ?

—এসো-না—এই দিকের বারান্দা থেকেই তো দেখা যায়, বলিয়া অরুণ তাহাকে লইয়া পশ্চিমের একটা দরজা খুলিয়া খোলা বারান্দায় আসিল। উপরে আকাশ ; বারান্দার আলিশায় ভর দিয়া সরযূ নীচে তাকাইয়া দেখিল, বিরাট ধ্বংস স্তূপ, চন্দ্রালোকে ভাল দেখা যায় না—তবুও ঐ পর্বতের মত ইষ্টকরাশিতে যে রহস্য লুক্কায়িত আছে, তাহার

স্মৃতি সরযূকে অভিভূত, আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। ভয়ে সে চোখ বুজিয়া স্বামীর বাহু অবলম্বন করিয়া বলিল—চলো, ঘরে যাই।

* * * *

সরযূর দিন মন্দ কাটিতেছিল না—শুধু রাত্রে যতক্ষণ অরুণ না আসে ততক্ষণ তার কেমন যেন ভয় ভয় করে। ভীষণ গরম বোধ হইলেও সে পশ্চিমের দরজা বা জানালা খুলিতে সাহস করে না। এমন কি দক্ষিণ দিকের শেষ জানালাটা হইতে পশ্চিমের ধ্বংসাবশেষ খানিকটা দেখা যায়, তাই সে-জানালাটাও বন্ধই রাখিয়া দেয়। অরুণ আসিয়া বলে, গরমে ঘামছো কেন? জানালা খুলতে পারনি? সরযূ চুপ করিয়া থাকে। অরুণ জানালা খুলে দেয়। মন্দ মন্দ দক্ষিণ হাওয়া আসিয়া সরযূর ঘর্মাক্ত দেহ শীতল করিয়া দেয়, তথাপি সরযূর মনে হয়, এই হাওয়া যেন কোনো শিশুর কাতর দীর্ঘশ্বাস, যেন কাহার নিষ্ঠুরতার ক্ষমাহীন ইতিহাস! মনের কথা সরযূ অরুণকে বলিতে পারে না, কিন্তু অনেকবার তাহার মনে হয়, এ ঘরটা তাহাদের শয়নগৃহ না হইলেই ভাল হইত। অরুণ কিন্তু এই ঘরটিকেই বেশী পছন্দ করে। গভীর রাত্রে সে উঠিয়া কতদিন পশ্চিমের জানালার কাছে গিয়া ধ্বংসস্তূপের দিকে চাহিয়া থাকে। অকস্মাৎ ঘুম ভাঙিয়া কতদিন সরযূ স্বামীকে এ অবস্থায় দেখিয়াছে; আস্তে আস্তে তাহার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছে—কি দেখছো! অরুণ হাসিয়া জবাব দিয়াছে—দেখছি, ঠাকুরদার আসতে আর কত দেরী!

সরযূ বলে—তা' দেখে কি হবে?

অরুণ বলে—ঠাকুরদা যে তোমারই কোলে আসবে সরযূ—তা'জান?

—না' তুমি কেমন করে জানলে?

—আমার বিশ্বাস, আর আমি তাই চাই। তুমি চাও না?

—না, ওরকম নিষ্ঠুর ছেলে আমার চাই না।

অরুণ আহত হইল, তথাপি সরযূকে বলিল—না, নিষ্ঠুর কেন হবে? তুমি কি পাগল হয়েছ সরযূ, ঐসব যক্ষ ইত্যাদির কথা কি বিশ্বাস করে মানুষে? আমার এই পশ্চিম দিক্‌টা, জানি না কেন, খুব ভাল লাগে—তাই দাঁড়িয়ে আছি। চলো, শুইগে।

অরুণ কথাটা চাপিয়া যায়। সরযূর আবাল্য অর্জিত শিক্ষাদীক্ষাকে আঘাত দিতে সে চায় না, কিন্তু অরুণের মনের অবস্থাটা সরযূ যেন বুঝিতে পারে। সরযূ মনে করে, স্বামী চান তাঁহার ঠাকুরদাকে ফিরিয়া পাইতে তাঁহার পুত্ররূপে—কিন্তু সরযূ স্বামীর এই ইচ্ছাকে কিছুতেই সমর্থন করিতে পারে না।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এ সম্বন্ধে কথার আদান-প্রদান কোন দিন হয় নাই, হইলে হয়ত কিছু ভাল হইত কিন্তু সরযূ নিজের গোপন মনের কথাটা নিজের কাছেই স্বীকার করিয়া লজ্জিত হয়।

কিন্তু একদিন সত্যই আবিষ্কৃত হইল যে, সরযূর মা হইবার অবস্থাটা হইয়াছে। সরযূ যেদিন ইহা জানিল সেদিন সে আনন্দে আত্মহারা হইলেও, কোথায় যেন একটা দুশ্চিন্তা তাহাকে কাঁটার মত খোঁচা দিতে লাগিল। তাহার কেবল মনে হইতে লাগিল যে, যে-যক্ষকে তাহাদের ঠাকুরদা ঘরের ভিতর বন্দী করিয়া হত্যা করিয়াছেন, সেই যক্ষই যেন সেই ঠাকুরদার আত্মাকে ফিরাইয়া আনিয়া সরযূর গর্ভে বন্দী করিয়াছে। এ বন্দিত্ব হইতে ঠাকুরদার আর মুক্তি নাই। ইহা যেন সেই যক্ষের কঠোর প্রতিশোধ।

এই চিন্তাটা সরযূর মনের মধ্যে যত বেশী প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল সরযূ ততই ভীত হইয়া উঠিতে লাগিল। শেষে সে একদিন অরুণের নিকট সব কথা খুলিয়া বলিল। অরুণ বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িল। অনেক ভাবিয়া সে সরযূকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিল।

শ্বশুর বাড়ি হইতে দূরে আসিয়া সরযূর মন অনেকখানি শান্ত হইলেও তাহার ভয় সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল না। স্বপ্নের ঘোরেও তাহার মনে

হইত, সেই যক্ষটা যেন তাহার সন্তানকে তাহার গর্ভ হইতে জীবন্ত বাহিরে আসিতে দিতেছে না।

সরযু স্বপ্নঘোরে কাঁদিয়া উঠে। তাহার মা একদিন সমস্ত শুনিয়া ভাল ডাক্তার আনাইলেন। চিকিৎসা চলিতে লাগিল, কিন্তু সরযূর সারিবার লক্ষণ দেখা গেল না।

*   *   *   *

সেদিন সন্ধ্যা হইতেই বৃষ্টি পড়িতেছিল। ঘোর অন্ধকার এবং জোরে বাতাস বহিতেছে। সরযূ নিজের ঘরে খাটে শুইয়া আছে, খাটের নীচে বাড়ির ঝি নাসিকাধ্বনি করিয়া ঘুমাইতেছে। হঠাৎ কোথায়র কোনো কিছু পতনের শব্দ হইল। সরযূর সর্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। ভয়ে সে একটু শব্দও বাহির করিতে পারিল না। তাহা কেবল মনে হইতে লাগিল—আজ বুঝি সেই যক্ষটার সঙ্গে তাহাদের ঠাকুরদার সংগ্রামের দিন। আজই ঠাকুরদা যে বাহিরে আসিতে চাইতেছে আর যক্ষটা তাহাকে আটকাইয়া দিতেছে, কিছুতেই বাহিরে আসিতে দিতেছে না—যক্ষটা যেন বলিতেছে,—সাবধান! বাহি হইতে চেষ্টা করিলেই মারিয়া ফেলিব। অননুভূত যন্ত্রণায় সরযূ সর্বাঙ্গ অভিভূত হইয়া গেল।

আতঙ্কে সরযু চক্ষু মুদ্রিত করিল—ধীরে ধীরে তাহার জ্ঞান লোপ পাইতেছে।

সমাপ্ত—